



নালক

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর











নালক

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর



আনন্দ

প্রথম সংস্করণ: ডিসেম্বর ১৯৮৬
প্রথম ই-বুক সংস্করণ: ২০২০

ISBN 978-81-7066-021-7 (print)
ISBN 978-93-90048-15-1 (e-book)

প্রকাশক: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
হেড অফিস: ৯৫ শরৎ বোস রোড, কলকাতা ৭০০ ০২৬
রেজিস্টার্ড অফিস: ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

CIN: U22121WB1957PTC023534

প্রচ্ছদ: কৃষ্ণেন্দু চাকী

সূচিপত্র



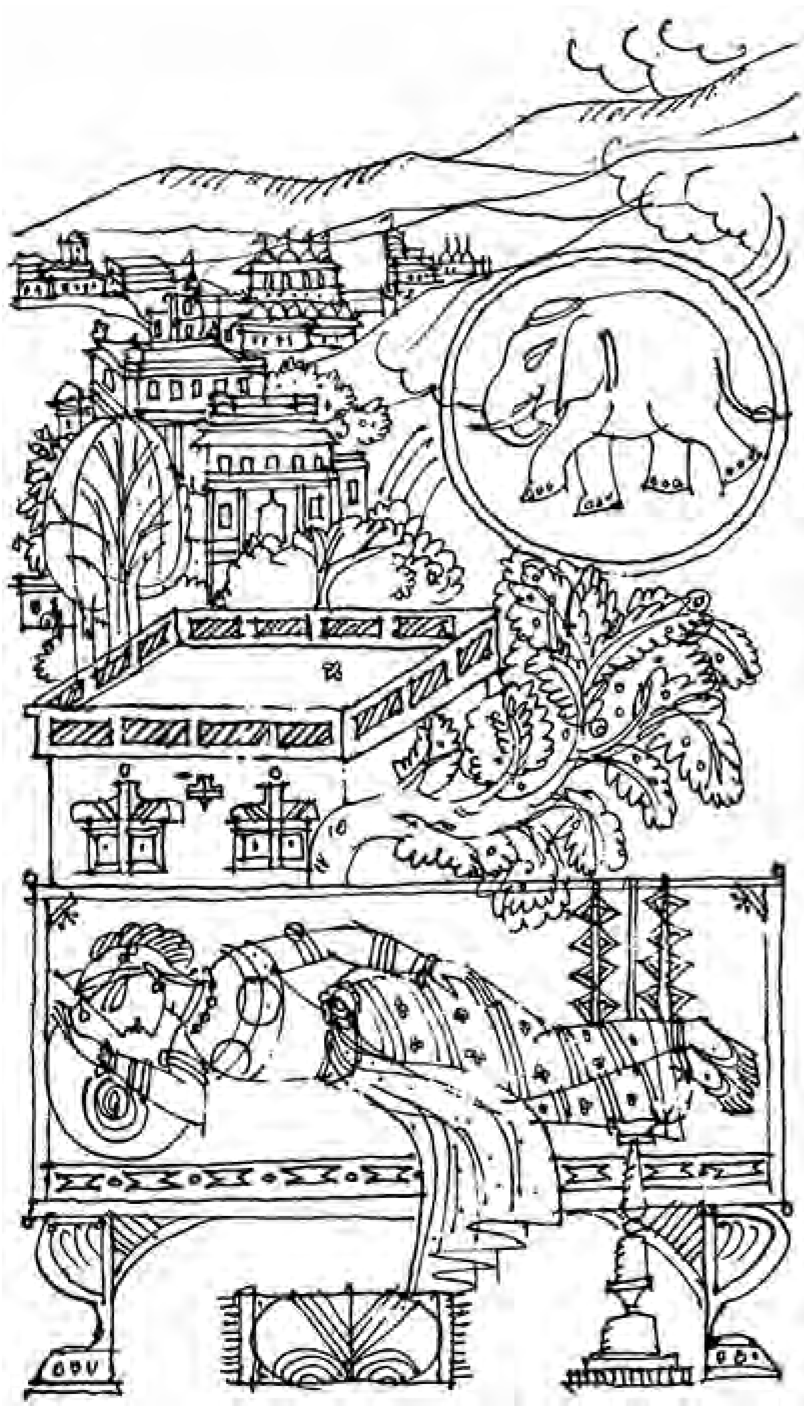
দেবলঋষি যোগে বসেছিলেন। নালক—সে একটি ছোট ছেলে—ঋষির সেবা করছিল। অন্ধকার বর্ধনের বন, অন্ধকার বটগাছতলা, অন্ধকার এপার-গঙ্গা ওপার-গঙ্গা। নিশুতি রাতে কালো আকাশে তারা ফুটেছে, বাতাস ঘুমিয়ে আছে, জলে ঢেউ উঠছে না, গাছে পাতা নড়ছে না। এমন সময় অন্ধকারে আলো ফুটল—ফুল যেমন করে ফোটে, চাঁদ যেমন করে ওঠে—একটু, একটু, আরো একটু। সমস্ত পৃথিবী দুলে উঠল—পদ্মপাতার জল যেমন দুলতে থাকে—এদিক- সেদিক, এধার-ওধার সে-ধার! ঋষি চোখ মেলে চাইলেন, দেখলেন আকাশে এক আশ্চর্য আলো! চাঁদের আলো নয়, সূর্যের আলো নয়, সমস্ত আলো মিশিয়ে এক আলোর আলো! এমন আলো কেউ কখনো দেখেনি। আকাশ-জুড়ে কে যেন সাত-রঙের ধ্বজা উড়িয়ে দিয়েছে। কোনো দেবতা পৃথিবীতে নেমে আসবেন তাই কে যেন শূন্যের উপর আলোর একটি-একটি ধাপ গেঁথে দিয়েছে! সন্ন্যাসী আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, নালককে বললেন—'কপিলবাস্তুতে বুদ্ধদেব জন্ম নেবেন, আমি তাঁর দর্শন করতে চললেম, তুমি সাবধানে থেক।'

বনের মাঝ দিয়ে আঁকা-বাঁকা সরু পথ, সন্ন্যাসী সেই পথে উত্তর-মুখে চলে গেলেন। নালক চুপটি করে বটতলায় ধ্যানে বসে দেখতে লাগল—একটির পর একটি ছবি।

কপিলবাস্তুর রাজবাড়ি। রাজরানী মায়াদেবী সোনার পালঙ্কে ঘুমিয়ে আছেন। ঘরের সামনে খোলা ছাদ, তার ওধারে বাগান, শহর, মন্দির মঠ। আর ওধারে—অনেক দূরে হিমালয় পর্বত—শাদা বরফে ঢাকা। আর সেই পাহারের ওধারে আকাশ-জুড়ে আশ্চর্য এক শাদা আলো; তার মাঝে সিঁদুরের টিপের মতো সূর্য উঠছেন। রাজা শুদ্ধোদন এই আশ্চর্য আলোর দিকে চেয়ে আছেন, এমন সময় মায়াদেবী জেগে উঠে বলছেন, 'মহারাজ, কি চমৎকার স্বপ্নই দেখলেম! এতটুকু একটি শ্বেতহস্তী, দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো বাঁকা-বাঁকা কচি দুটি দাঁত, সে যেন হিমালয়ের ওপার থেকে মেঘের উপর দিয়ে আমার কোলে নেমে এল, তারপর যে কোথায় গেল আর দেখতে পেলেম না! আহা, কপালে তার সিঁদুরের টিপের মতো একটি টিপ ছিল।'

রাজা-রানী স্বপ্নের কথা বলাবলি করছেন, ইতিমধ্যে সকাল হয়েছে, রাজবাড়ির নবৎখানার বাঁশি বাজছে, রাস্তা দিয়ে লোকজন চলাফেরা করছে, মন্দির থেকে শাঁখ-ঘন্টার শব্দ আসছে, অন্দরমহলে রাজদাসীরা সোনার কলসীতে মায়াদেবীর চানের জল তুলে আনছে, মালিনীরা সোনার থালায় পুজোর ফুল গুছিয়ে রাখছে। রানীর পোষা ময়ূর ছাদে এসে উঠে বসল, সোনার খাঁচায় শুকশারী খাবারের জন্য দাসীদের সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দিলে, ভিখিরী এসে 'জয় রানীমা' বলে দরজায় দাঁড়াল। দেখতে-দেখতে বেলা হল, রাজবাড়িতে রানীর স্বপ্নের কথা নিয়ে সকলে বলাবলি করতে লাগল। কপালে রক্ত-চন্দনের তিলক, মাথায় মানিকের মুকুট, পরনে লাল চেলী, সকালে সূর্যের মতো রাজা শুদ্ধোদন রাজসিংহাসন আলো করে বসেছেন। পাশে মন্ত্রীবর, তাঁর পাশে দণ্ডধর—সোনার ছড়ি হাতে, ওপাশে ছত্রধর—শ্বেতছত্তর খুলে, তার ওপাশে নগরপাল—ঢাল-খাঁড়া নিয়ে।

রাজার দুইদিকে দুই দালান; একদিকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আর একদিকে দেশবিদেশের রাজা আর রাজপুত্তুর। রাজসভা ঘিরে দেশের প্রজা, তাঁদের ঘিরে যত দুয়ারী—মোটা রায়বাঁশের লাঠি আর কেবল লাল-পাগড়ির ভিড়।



রাজসভার ঠিক মাজখানে লাল চাঁদোয়ার ঠিক নিচে আটখানি রক্তকম্বলের আসন, তারি উপরে রাজার আট গণৎকার খড়ি-হাতে, পুঁথি খুলে, রানীর স্বপ্নের কথা গণনা করতে বসেছেন। তাঁদের কারো মাথায় পাকা চুল, কারো মাথায় টাক, কারো বা ঝুঁটি বাঁধা, কারো বা ঝাঁটা গোঁফ! সকলের হাতে এক-এক শামুক নস্যি। আট পণ্ডিত কেউ কলমে লিখে, কেউ খড়িতে দেগে রানীর স্বপ্নের ফল গুণে বলছেন:

'সূর্যস্বপ্নে রাজচক্রবর্তী পুত্র মহাতেজস্বী। চন্দ্রে তথা রূপবান গুণবান রাজাধিরাজ দীর্ঘজীবী। শ্বেতহস্তীর স্বপ্নে শান্ত গম্ভীর জগৎ-দুর্লভ এবং জীবের দুঃখহারী মহাধার্মিক ও মহাবুদ্ধ পুত্রলাভ। এবার নিশ্চয় মহারাজ, এক মহাপুরুষ এই শাক্যবংশে অবতীর্ণ হবেন। শাস্ত্রের বচন মিথ্যা হয় না। আনন্দ কর।'

চারিদিকে অমনি রব উঠল—'আনন্দ কর, আনন্দ কর! অন্নদান কর, বস্ত্রদান কর, দীপদান, ধূপদান, ভূমিদান কর।' কপিলবাস্তুতে রাজার ঘরে, প্রজার ঘরে, হাটে-মাঠে-ঘাটে আনন্দের বাজনা বেজে উঠল, আকাশ আনন্দে হাসতে লাগল, বাতাস আনন্দে বইতে লাগল। রাজমুকুটের মানিকের দুল, রাজ-ছত্তরের মুক্তোর ঝালর, মন্ত্রীর গলায় রাজার-দেওয়া কণ্ঠ-মালা, পণ্ডিতদের গায়ে রানীর দেওয়া ভোটকম্বল, দাসদাসী দীনদুঃখী ছেলে-বুড়োর মাথায় রাজবাড়ির লাল চেলী আনন্দে দুলতে থাকল। প্রকাণ্ড বাগান; বাগানের শেষ দেখা যায় না, কেবলি গাছ, গাছের পর গাছ, আর সবুজ ঘাস; জলের হাওয়া, ঠাণ্ডা ছাওয়া, পাখিদের গান আর ফুলের গন্ধ। বাগানের মাঝে এক প্রকাণ্ড পদ্মপুকুর। পদ্মপুকুরের ধারে আকাশ-প্রমাণ এক শাল গাছ, তার ডালে-ডালে পাতায়-পাতায় ফুল ধরেছে; দখিনে বাতাসে সেই ফুল গাছতলায় একটি শ্বেতপাথরের চৌকির উপরে উড়ে পড়ছে।

সন্ধ্যে হয়ে এল। সুরূপা যত পাড়ার মেয়ে পদ্মপুকুরে গা ধুয়ে উঠে গেল। উবু ঝুঁটি, গলায় কাঁটি, দুই কানে সোনার মাকড়ি একদল মালি-মালিনী শুকনো পাতা ঝাঁট দিতে-দিতে, ফুলের গাছে জল দিতে-দিতে, বেলা শেষে বাগানের কাজ সেরে চলে গেল। সবুজ ঘাসে, পুকুর পাড়ে, গাছের তলায়—কোনোখানে কোনো-কোণে একটু ধুলো, একটি কুটোও রেখে গেল না। রাত আসছে—বসন্তকালের পূর্ণিমার রাত! পশ্চিমে সূর্য ডুবছেন, পুবে চাঁদ উঠি উঠি করছেন। পৃথিবীর একপারে সোনার শিখা, আর একপারে রুপোর রেখা দেখা যাচ্ছে। মাথার উপর নীল আকাশ, লক্ষকোটি তারায় আর সন্ধিপুজোয় শাঁক-ঘণ্টায় ভরে উঠেছে। এমন সময় মায়াদেবী রুপোর জালে ঘেরা সোনার পালকিতে সহচরী-সঙ্গে বাগান-বেড়াতে এলেন; রানীকে ঘিরে রাজদাসী যত ফুলের পাখা, পানের বাটা নিয়ে। প্রিয় সখীর হাতে হাত রেখে, ছায়ায়-ছায়ায় চলে ফিরে, রানী এসে বাগানের মাঝে প্রকাণ্ড সেই শালগাছের তলায় দাঁড়ালেন—বাঁ হাতখানি ফুলে-ফুলে ভরা শালগাছের ডালে, আর ডানহাতখানি কোমরে রেখে।

অমনি দিন শেষ হল, পাখিরা একবার কলরব করে উঠল, বাতাসে অনেক ফুলের গন্ধ, আকাশে অনেক তারার আলো ছড়িয়ে পড়ল। পুবে পূর্ণিমার চাঁদ উদয় হলেন—শালগাছটির উপরে যেন একটি সোনার ছাতা! ঠিক সেই সময় বুদ্ধদেব জন্ম নিলেন—যেন একটি সোনার পুতুল, চাঁপাফুলে-ঘেরা পৃথিবীতে যেন আর এক চাঁদ। চারিদিক আলোয়-আলো হয়ে গেল—কোনোখানে আর অন্ধকার রইল না। মায়া মায়ের কোলে বুদ্ধদেব দেখা দিলেন, পৃথিবীর বুক জুড়িয়ে বুদ্ধদেব দেখা দিলেন—যেন পদ্মফুলের উপর এক ফোঁটা শিশির—নির্মল, সুন্দর, এতটুকু। দেখতে-দেখতে লুম্বিনী বাগান লোকে-লোকারণ্য হয়ে উঠল, পাত্র-মিত্র-অনুচর-সভাসদ সঙ্গে রাজা শুদ্ধোদন রাজপুত্রকে দেখতে এলেন। দাসদাসীরা মিলে শাঁখ বাজাতে লাগল, উলু দিতে থাকল। স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে, আকাশে মেঘে-মেঘে দেবতার দুন্দুভি বাজছে, মর্ত্যের ঘরে-ঘরে শাঁখঘণ্টা, পাতালের তলে-তলে—জগঝম্প, জয়ডঙ্কা বেজে উঠছে। বুদ্ধদেব তিনলোক-জোড়া তুমুল আনন্দের মাঝখানে জন্ম নিয়ে পৃথিবীর উপরে প্রথম সাত-পা চলে যাচ্ছেন। সুন্দর পা দুখানি যেখানে-যেখানে পড়ল সেখানে-সেখানে অতল, সুতল, রসাতল ভেদ করে একটি-একটি সোনার পদ্ম, আগুনের চরকার মতো, মাটির উপরে ফুটে

উঠল; আর স্বর্গ থেকে সাতখানি মেঘ এসে সাত-সমুদ্রের জল এনে সেই-সেই সাতটি পদ্মের উপরে ঝির-ঝির করে ঢালতে লাগল!

নালক আশ্চর্য হয়ে দেখছে, দেব-দানব-মানবে মিলে সেই সাতপদ্মের মাঝখানে বুদ্ধদেবকে অভিষেক করেছেন! এমন সময় নালকের মা এসে ডাকলেন—'দস্যি ছেলে! ঋষি এখানে নেই আর তুমি একা এই বনে বসে রয়েছ! না ঘুম, না খাওয়া, না লেখাপড়া—কেবল চোখ বুজে ধ্যান করা হচ্ছে! এই বয়সে উনি আবার সন্ন্যাসী হয়েছেন! চল্, বাড়ি চল্!' মা নালকের হাত ধরে টেনে নিয়ে চললেন, নালক মাটিতে লুটোপুটি খেয়ে বলতে লাগল—'ছেড়ে দাও মা, তারপর কি হল দেখি! একটিবার ছাড়। মাগো, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে!' সমস্ত বন নালকের দুঃখে কেঁদে-কেঁদে বলতে লাগল—ছেড়ে দে, ছেড়ে দে! আর ছেড়ে দে! একেবারে ঘরে এনে তালাবন্ধ! নালককে তারা জোর করে গুরুমশায়ের পাঠশালায় দিয়েছে। সেখানে গুরু বলছেন—'ওকাস অহং ভন্তে।' নালক পড়ে যাচ্ছে—ভন্তে। গুরু বলছেন—'লেখ্ অনুগ্ গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে!' নালক বড় বড় করে তালপাতায় লিখে যাচ্ছে—'সীলং দেথ মে ভন্তে।' কিন্তু তার লেখাতেও মন নেই, পড়াতেও মন নেই। তার প্রাণ বর্ধনের বনে সেই বটতলায় আর সেই কপিলবাস্তুর রাজধানীতে পড়ে আছে। পাঠশালের খোড়ো-ঘরের জানলা দিয়ে একটি তিন্তিড়ী গাছ, খানিকটা কাশ আর কাঁটাবন, একটা বাঁশঝাড় আর একটি পুকুর দেখা যায়। দুপুরবেলা একটুখানি রোদ সেখানটায় এসে পড়ে, একটা লালঝুঁটি কুবোপাখি ঝুপ করে ডালে এসে বসে আর কুব্কুব্ করে ডাকতে থাকে, কাঁটাগাছের ফুলের উপরে একটা কালো ভোমরা ভন-ভন করে উড়ে বেড়ায়—একবার জানলার কাছে আসে আবার উড়ে যায়। নালক সেই দিকে চেয়ে থাকে আর ভাবে—আহা, ওদের মতো যদি ডানা পেতাম তবে কি আর মা আমায় ঘরে বন্ধ রাখতে পারতেন? এক দৌড়ে বনে চলে যেতাম। এমন সময় গুরু বলে ওঠেন—'লেখ্রে লেখ্!' অমনি বনের পাখি উড়ে পালায়, তালপাতার উপরে আবার খস-খস করে ছেলেদের কলম চলতে থাকে। নালক যে কি কষ্টে আছে তা সেই জানে! হাত চলছে না, তবু পাতাড়ি-লেখা বন্ধ করবার জো নেই, কান্না আসুক তবু পড়ে যেতে হবে—য র ল, শ ষ স—বাদলের দিনেও, গরমের দিনেও, সকালেও, দুপুরেও।



নালক পাঠশালা থেকে মায়ের হাত ধরে যখন বাড়ি ফেরে, হয়তো শালগাছের উপরে তালগাছগুলোর মাথা দুলিয়ে পুবে-হাওয়া বইতে থাকে, বাঁশঝাড়ে কাকগুলো ভয়ে কা-কা করে ডেকে ওঠে। নালক মনে-মনে ভাবে আজ যদি এমন একটা ঝড় ওঠে যে আমাদের গ্রামখানা ঐ পাঠশালার খোড়ো চালটাসুদ্ধ একেবারে ভেঙে-চুরে উড়িয়ে নিয়ে যায়, তবে বনে গিয়ে আমাদের থাকতেই হয়, তখন আর আমাকে ঘরে বন্ধ করবার উপায়

থাকে না। রাতের বেলায় ঘরের বাইরে বাতাস শন-শন বইতে থাকে, বিদ্যুতের আলো যতই ঝিকমিক চমকাতে থাকে, নালক ততই মনে-মনে ডাকতে থাকে, ঝড় আসুক, আসুক বৃষ্টি! মাটির দেয়াল গলে যাক, কপাটের খিল ভেঙে যাক। ঝড়ও আসে, বৃষ্টিও নামে, চারিদিক জলে-জলময় হয়ে যায়; কিন্তু হায়! কোনোদিন কপাটও খোলে না, দেয়ালও পড়ে না—যে বন্ধ সেই বন্ধ! খোলা মাঠ, খোলা আকাশে ঘেরা বর্ধনের সেই তপোবনে নালক আর কেমন করে ফিরে যাবে? যেখানে পাখিরা আনন্দে উড়ে বেড়ায়, হরিণ আনন্দে খেলে বেড়ায়, গাছের তলায় মাঠের বাতাসে যেখানে ধরে রাখবার কেউ নেই—সবাই ইচ্ছামতো খেলে বেড়াচ্ছে, উড়ে বেড়াচ্ছে।



ঋষির আশাপথ চেয়ে নালক দিন গুণছে, ওদিকে দেবলঋষি কপিলবাস্তু থেকে বুদ্ধদেবের পদধূলি সর্বাঙ্গে মেখে, আনন্দে দুই হাত তুলে নাচতে-নাচতে পথে আসছেন আর গ্রামে-গ্রামে গান গেয়ে চলেছেন—'নমো নমো বুদ্ধদিবাকরায়। নমো নমো গৌতম চন্দ্রিমায়। নমো অনন্তগুণার্ণবায়, নমো শাক্যনন্দনায়।' শরৎকাল। আকাশে সোনার আলো। পথের দুইধারে মাঠে-মাঠে সোনার ধান। লোকের মন আর ঘরে থাকতে চায় না।

রাজারা ঘোড়া সাজিয়ে দিগ্বিজয়ে চলেছেন, প্রজারা দলে-দলে ঘর ছেড়ে হাটে-মাঠে-ঘাঠে—কেউ পসরা মাথায়, কেউ ধানক্ষেত নিড়োতে, কেউবা সাত-সমুদ্র-তেরো-নদী-পারে বাণিজ্য করতে চলেছে। যাদের কোনো কাজ নেই তারাও দল-বেঁধে ঋষির সঙ্গে সঙ্গে গান গেয়ে চলেছে—'নমো নমো বুদ্ধদিবাকরায়!'

সন্ধ্যাবেলা। নীল আকাশে কোনোখানে একটু মেঘের লেশ নেই, চাঁদের আলো আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত নেমে এসেছে, মাথার উপর আকাশ-গঙ্গা এক টুকরো আলোর জালের মতো উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত দেখা দিয়েছে। দেবলঋষি গ্রামের পথ দিয়ে গেয়ে চলেছেন—'নমো নমো গোতমচন্দ্রিমায়।' মায়ের কোলে ছেলে শুনছে—'নমো নমো গোতমচন্দ্রিমায়!' ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে মা শুনছেন—'নমো নমো'; বুড়ি দিদিমা ঘরের ভিতর থেকে শুনছেন—'নমো'; অমনি তিনি সবাইকে ডেকে বলছেন—'ওরে নোমো কর্, নোমো কর্।' গ্রামের ঠাকুরবাড়ির শাঁখঘণ্টা ঋষির গানের সঙ্গে একতানে বেজে উঠছে—নমো নমো নমো! রাত যখন ভোর হয়ে এসেছে, শিশিরে নুয়ে পদ্ম যখন বলছে—নমো, চাঁদ পশ্চিমে হেলে বলছেন—নমো, সেই সময়ে নালক ঘুম থেকে উঠে বসেছে আর অমনি ঋষি এসে দেখা দিয়েছেন! আগল খুলে গেছে। খোলা দরজায় সোনার রোদ একেবারে ঘরের ভিতর পর্যন্ত এসে নালকের মাথার উপরে পড়েছে। নালক উঠে ঋষিকে প্রণাম করেছে আর ঋষি নালককে আশীর্বাদ করছেন—'সুখী হও, মুক্ত হও।'

ঋষির হাত ধরে নালক পথে এসে দাঁড়িয়েছে, নালকের মা দুই চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে ঋষিকে বলছেন—'নালক ছাড়া আমার কেউ নেই, ওকে নিয়ে যাবেন না।'

ঋষি বলছেন—'দুঃখ কর না, আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে নালককে ফিরে পাবে। ভয় কর না; এস, তোমার নালককে বুদ্ধদেবের পায়ে সঁপে দাও।' ঋষি মন্ত্র পড়তে থাকলেন আর নালকের মা ছেলের দুই হাত ধরে বলতে লাগলেন—

'কুসুমং ফুল্লিতং এতং পগ্গহেত্বান অঞ্জলিং
বুদ্ধ সেষ্ঠং সবিত্বান আকাসেমপিপূজয়ে।'

নির্মল আকাশের নিচে বুদ্ধদেবের পূজা করি; সুন্দর আমার (নালক) ফুল তাঁকে দিয়ে পূজা করি।

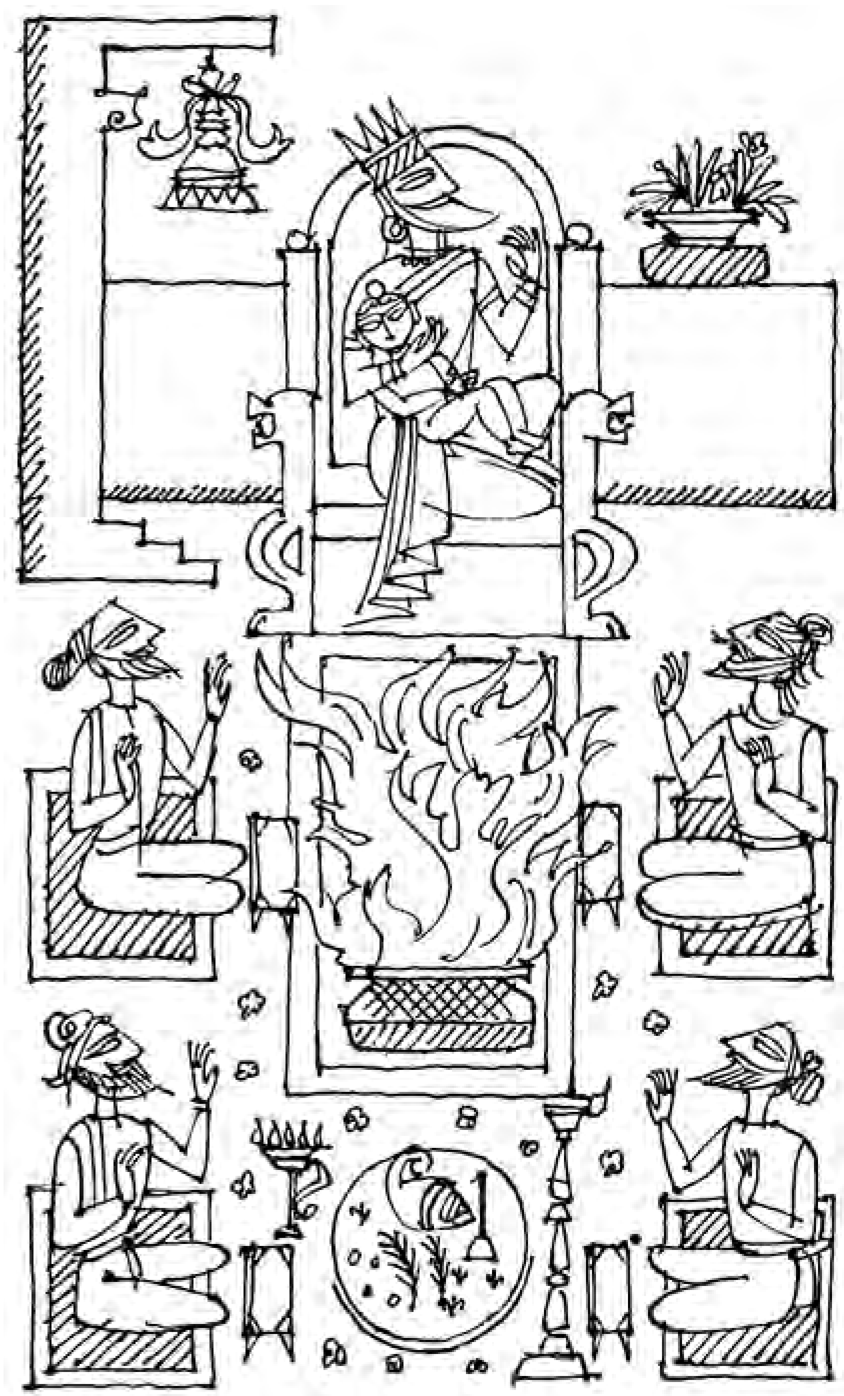
ঋষি নালকের হাত ধরে বনের দিকে চলে গেলেন।

আবার সেই বর্ধনের বন, সেই বটগাছের তলা! গাছের নিচে দেবলঋষি আর সন্ন্যাসীর দল আগুনের চারিদিক ঘিরে বসেছেন, আগুনের তেজে সন্ন্যাসীদের হাতের ত্রিশূল ঝক-ঝক করছে।

নিবিড় বন। চারিদিকে কাজল অন্ধকার, কিছু আর দেখা যায় না, কেবল গোছা-গোছা অশথ-পাতায়, মোটা-মোটা গাছের শিকড়ে আর সন্ন্যাসীদের জটায়, তপ্ত সোনার মতো রাঙা আলো ঝিক-ঝিক করছে—যেন বাদলের বিদ্যুৎ!

এই অন্ধকারে নালক চুপটি করে আবার ধ্যান করছে! মাথার উপরে নীলাম্বরী আকাশ, বনের তলায় স্থির অন্ধকার। কোনো দিকে কোনো সাড়া নেই, কারো মুখে কোনো কথা নেই, কেবল এক-একবার দেবলঋষি বলেছেন—'তার পরে?' আর নালকের চোখের সামনে ছবি আসছে আর সে বলে যাচ্ছে: 'রাজাশুদ্ধোদন বুদ্ধদেবকে কোলে নিয়ে হরিণের ছাল-ঢাকা গজদন্তের সিংহাসনে বসেছেন, রাজার দুই পাশে চার-চার গণৎকার, রাজার ঠিক সামনে হোমের আগুন, ওদিকে গোতমী মা, তাঁর চারিদিকে ধান-দূর্বা, শাঁখ-ঘণ্টা, ফুল-চন্দন, ধূপ-ধুনো। 'পূজা শেষ হয়েছে। রাজা ব্রাহ্মণদের বলছেন—রাজপুত্রের নাম হল কি?

‘ব্রাহ্মণেরা বলছেন—এই রাজকুমার হতে পৃথিবীর লোক যত অর্থ, যত সিদ্ধি লাভ করবে—সেইজন্য এঁর নাম রইল সিদ্ধার্থ; রাজা হলে এই রাজকুমার জীবনে সকল অর্থ আর রাজা না হলে বন্ধুত্ব লাভ করে জগৎকে কৃতার্থ করবেন আর মরণের পরে নির্বাণ পেয়ে নিজেও চরিতার্থ হবেন—সেইজন্য এঁর নাম হল সিদ্ধার্থ।



'রাজা বলছেন—কুমার সিদ্ধার্থ রাজা হয়ে রাজত্ব করবেন, কি রাজ্য ছেড়ে বনে গিয়ে বুদ্ধত্ব পাবার জন্যে তপস্যা করবেন? সেই কথা আপনারা স্থির করে বলুন।

'রাজার আট গণৎকার খড়ি পেতে গণনা করে বলছেন। প্রথম শ্রীরাম আচার্য, তিনি রাজাকে দুই আঙুল দেখিয়ে বলছেন—মহারাজ, ইনি রাজাও হতে পারেন, সন্ন্যাসীও হতে পারেন, ঠিক বলা কঠিন, দুইদিকেই সমান টান দেখছি। রামের ভাই লক্ষ্মণ অমনি দুই চোখ বুজে বলছেন—দাদা যা বলেছেন তাই ঠিক। জয়ধ্বজ দুই হাত ঘুরিয়ে বলছেন—হ্যাঁও বটে, নাও বটে। শ্রীমন্তিন দুইদিকেই ঘাড় নেড়ে বলছেন—আমারও ঐ কথা। ভোজ দুই চোখ পাক্‌ল করে বলছেন—এটাও দেখছি, ওটাও দেখছি। সুদত্ত বলছেন, ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় নেড়ে—এদিকও দেখলেম, ওদিকও দেখলেম। সুদত্তের ভাই সুবাম দুই নাকে নস্যি টেনে বললেন—দাদার দিকটাই ঠিক দেখছি। কেবল সবার ছোট অথচ বিদ্যায় সকলের বড় কৌণ্ডিন্য এক আঙুল রাজার দিকে দেখিয়ে বলছেন—মহারাজ, এদিক কি ওদিক, এটা কি ওটা নয়—এই রাজকুমার বুদ্ধ হওয়া ছাড়া আর কোনোদিকেই যাবেন না স্থিরনিশ্চয়। ইনি কিছুতেই ঘরে থাকবেন না। যেদিন এঁর চোখে এক জরাজীর্ণ বৃদ্ধ মানুষ, রোগশীর্ণ দুঃখী মানুষ, একটি মরা মানুষ আর এক সন্ন্যাসী ভিখারী পড়বে, সেদিন আপনার সোনার সংসার অন্ধকার করে কুমার সিদ্ধার্থ চলে যাবেন—সোনার শিকল কেটে পাখি যেমন উড়ে যায়।' সন্ন্যাসীর দল হুঙ্কার দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। নালক চেয়ে দেখল সকাল হয়েছে।

আর কিছু দেখা যায় না! সেদিন থেকে নালক যখনি ধ্যান করে তখনি দেখে সূর্যের আলোয় আগুনের মতো ঝক-ঝক করছে—আকাশের নীল ঢেকে, বাতাসের চলা বন্ধ করে—সোনার-ইঁটে বাঁধানো প্রচণ্ড প্রকাণ্ড এক সোনার দেয়াল। তার শেষ নেই, আরম্ভও দেখা যায় না। নালকের মন-পাখি উড়ে-উড়ে চলে আর সেই দেয়ালে বাধা পেয়ে ফিরে-ফিরে আসে। এমনি করে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কাটছে। সোনার দেয়ালের ওপারে রয়েছেন সিদ্ধার্থ আর এপারে রয়েছে নালক—যেন খাঁচার পাখি আর বনের পাখি।

ছেলে পাছে সন্ন্যাসী হয়ে চলে যায় সেই ভয়ে রাজা শুদ্ধোদন সোনার স্বপন দিয়ে, হাসি আর বাঁশি, আমোদ আর আহ্লাদের মায়া দিয়ে সিদ্ধার্থকে বন্ধ রেখেছেন—সোনার খাঁচায় পাখিটির মতো। যখন গরমের দিনে রোদের তেজ বাড়ে, জল শুকিয়ে যায়, তপ্ত বাতাসে চারিদিক যেন জ্বলতে থাকে; বর্ষায় যখন নতুন মেঘ দেখা দেয়, জলের ধারায় পৃথিবী ভেসে যায়, নদীতে স্রোত বাড়ে; শরতের আকাশ যখন নীল হয়ে ওঠে, শাদা মেঘ পাতলা হওয়ায় উড়ে চলে, নদীর জল সরে গিয়ে বালির চড়া জেগে ওঠে, শীতে যখন বরফ আর কুয়াশায় চারিদিক ঢাকা পড়ে, পাতা খসে যায়, ফুল ঝরে যায়; আবার বসন্তে ফুলে-ফুলে পৃথিবী ছেয়ে যায়, গন্ধে আকাশ ভরে ওঠে, দখিনে বাতাসে চাঁদের আলোয়, পাখির গানে আনন্দ ফুটে-ফুটে পড়তে থাকে—তখন খাঁচার পাখির মন যেমন করে, সোনার দেয়ালে-ঘেরা রাজমন্দিরে বুদ্ধদেবেরও মন তেমনি করে—এই সোনার খাঁচা ভেঙে বাইরে আসতে। তিনি যেন শোনেন—সমস্ত জগৎ, সারা পৃথিবী গরমের দিনে, বাদলা রাতে, শরতের সন্ধ্যায়, শীতের সকালে, বসন্তের পহরে পহরে—কখনো কোকিলের কুহু কখনো বাতাসের হুহু, কখনো বা বিষ্টির ঝর-ঝর, শীতের থর-থর, পাতার মর্মর দিয়ে কেঁদে-কেঁদে মিনতি করে তাঁকে ডাকছে—বাহিরে এস, বাহিরে এস, নিস্তার কর, নিস্তার কর! ত্রিভুবনে দুঃখের আগুন জ্বলছে, মরণের আগুন জ্বলছে, শোকে তাপে জীবন শুকিয়ে যাচ্ছে। দেখ চোখের জলে বুক ভেসে গেল, দুঃখের বান মনের বাঁধ ধ্বসিয়ে দিয়ে

গেল। আনন্দ—সে তো আকাশের বিদ্যুতের মতো—এই আছে এই নেই; সুখ—সে তো শরতের মেঘের মতো, ভেসে যায়, থাকে না; জীবন—সে তো শীতের শিশিরে শিউলি ফুলের মতো ঝরে পড়ে; বসন্তকাল সুখের কাল—সে তো চিরদিন থাকে না! হায়রে, সারা পৃথিবীতে দুঃখের আগুন মরণের চিতা দিনরাত্রি জ্বলছে, সে আগুন কে নেবায়? পৃথিবী থেকে ভয়কে দূর করে এমন আর কে আছে—তুমি ছাড়া? মায়ায় আর ভুলে থেক না, ফুলের ফাঁস ছিঁড়ে ফেল, বাহিরে এস—নিস্তার কর! জীবকে অভয় দাও!

নালকের প্রাণ, সারা পৃথিবীর লোকের প্রাণ, আকাশের প্রাণ, বাতাসের প্রাণ বুদ্ধদেবকে দেখবার জন্য আকুলি-বিকুলি করছে। তাদের মনের দুঃখু কখনো বিষ্টির মতো ঝরে পড়ছে, কখনো ঝড়ের মতো এসে সোনার দেয়ালে ধাক্কা দিচ্ছে; আলো হয়ে ডাকছে—এস! অন্ধকার হয়ে বলছে—নিস্তার কর! রাঙা ফুল হয়ে ফুটে উঠছে, আবার শুকনো পাতা হয়ে ঝরে পড়ছে—সিদ্ধার্থের চারিদিকে চোখের সামনে জগৎ-সংসারের হাসি-কান্না, জীবন-মরণ—রাতে-দিনে মাসে-মাসে বছরে-বছরে নানাভাবে নানাদিকে।

একদিন তিনি দেখছেন নীল আকাশের গায়ে পারিজাত ফুলের মালার মতো একদল হাঁস সারি বেঁধে উড়ে চলেছে—কি তাদের আনন্দ! হাজার হাজার ডানা একসঙ্গে তালে-তালে উঠছে পড়ছে, এক সুরে হাজার হাঁস ডেকে চলেছে চল্, চল্, চল্রে চল্! আকাশ তাদের ডাকে সাড়া দিয়েছে; মেঘ চলেছে শাদা পাল তুলে, বাতাস চলেছে মেঘের পর মেঘ ঠেলে, পৃথিবী তাদের ডাকে সাড়া দিয়েছে। নদী চলেছে সমুদ্রের দিকে, সমুদ্র আসছে নদীর দিকে—পাহাড় ভেঙে বালি ঠেলে। আনন্দে এত চলা এত বলা এত খেলার মাঝে কার হাতের তীর বিদ্যুতের মতো গিয়ে একটি হাঁসের ডানায় বিঁধল, অমনি যন্ত্রণার চিৎকারে দশদিক শিউরে উঠল। রক্তের ছিটেয় সকল গা ভাসিয়ে দিয়ে ছেঁড়া মালার ফুলের মতো তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল তীরে-বেঁধা রাজহাঁস। কোথায় গেল তার এত আনন্দ—সেই বাতাস দিয়ে ভেসে চলা, নীল আকাশে ডেকে চলা! এক নিমেষে ফুরিয়ে গেল পৃথিবীর সব আনন্দ, সব প্রাণ! আকাশ খালি হয়ে গেল, বাতাসের চলা বন্ধ হয়ে গেল; সব বলা, সব চলা, সব খেলা শেষ হয়ে গেল একটি তীরের ঘা পেয়ে! কেবল দূর থেকে—সিদ্ধার্থের কানের কাছে, প্রাণের কাছে বাজতে লাগল—কান্না আর কান্না! বুক ফেটে কান্না! দিনে রাতে, যেতে আসতে, চলতে ফিরতে, সুখের মাঝে, শান্তির মাঝে, কাজে কর্মে, আমোদে-আহ্লাদে তিনি শুনতে থাকলেন—কান্না আর কান্না! জগৎ-জোড়া কান্না। ছোটর ছোট তার কান্না, বড়র বড় তাদেরও কান্না।



দিবারাত্রি ক্রমাগত ঝড়বৃষ্টি, অন্ধকারের পরে সেদিন মেঘ কেটে গিয়ে সকালের আলো পুবদিকে দেখা দিয়েছে, আকাশ আজ আনন্দে হাসছে, বাতাস আনন্দে বইছে, মেঘের গায়ে-গায়ে মধুপিঙ্গল আলো পড়েছে; বনে-বনে পাখিরা, গ্রামে-গ্রামে চাষীরা, ঘরে-ঘরে ছেলে-মেয়েরা আজ মধুমঙ্গল গান গাইছে। পুবের দরজায় দাঁড়িয়ে সিদ্ধার্থ দেখছেন—আজ যেন কোথাও দুঃখ নেই, কান্না নেই! যতদূর দেখা যায়, যতখানি শোনা যায়—

সকলি আনন্দ। মাঠের মাঝে আনন্দ সবুজ হয়ে দেখা দিয়েছে! বনে-উপবনে আনন্দ ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে; ঘরে-ঘরে আনন্দ ছেলে-মেয়েরা হাসিমুখে, রঙিন কাপড়ে, নতুন খেলনায় ঝিক-ঝিক করছে, ঝুম-ঝুম বাজছে; আনন্দ—পুষ্পবৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ছে—লতা থেকে পাতা থেকে; আনন্দ—সে সোনার ধুলো হয়ে উড়ে চলেছে পথে-পথে—যেন আবির খেলে।

সিদ্ধার্থের মনোরথ—সিদ্ধার্থের সোনার রথ আজ আনন্দের মাঝ দিয়ে পুবের পথ ধরে সকালের আলোর দিকে অন্ধকারের শেষের দিকে এগিয়ে চলেছে—আস্তে-আস্তে। মনে হচ্ছে—পৃথিবীতে আজ দুঃখ নেই, শোক নেই, কান্না নেই, রয়েছে কেবল আনন্দ—ঘুমের পরে জেগে ওঠার আনন্দ, অন্ধকারের পরে আলো পাওয়ার আনন্দ, ফুলের মতো ফুটে ওঠা, মালার মতো দুলে ওঠা, গানে-গানে বাঁশির তানে জেগে ওঠার আনন্দ। পৃথিবীতে কিছু যেন আজ ঝরে পড়ছে না, ঝুরে মরছে না।

এমন সময় সকালের এত আলো, এত আনন্দ, ঝড়ের মুখে যেন প্রদীপের মতো নিবিয়ে নিয়ে সিদ্ধার্থের রথের আগে কে জানে কোথা থেকে এসে দাঁড়াল—অন্তহীন দন্তহীন একটা বুড়ো মানুষ লাঠিতে ভর দিয়ে। তার গায়ে একটু মাংস নেই, কেবল ক'খানা হাড়! বয়েসের ভারে সে কুঁজো হয়ে পড়েছে, তার হাত কাঁপছে, পা কাঁপছে, ঘাড় কাঁপছে; কথা বলতে কথাও তার কেঁপে যাচ্ছে। চোখে সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না, কানে সে কিছু শুনতে পাচ্ছে না—কেবল দু'খানা পোড়া কাঠের মতো রোগা হাত সামনে বাড়িয়ে সে আলোর দিক থেকে অন্ধকারের দিকে চলে যাচ্ছে—গুটি-গুটি, একা! তারশক্তি নেই, সামর্থ্য নেই, নেই তার একটি আপনার লোক, নেই তার সংসারে ছেলে-মেয়ে বন্ধু-বান্ধব; সব মরে গেছে, সব ঝরে গেছে—জীবনের সব রঙ্গরস শুকিয়ে গেছে—সব খেলা শেষ করে! আলো তার চোখে এখন দুঃখ দেয়, সুর তার কানে বেসুরো বাজে, আনন্দ তার কাছে নিরানন্দ ঠেকে। সে নিজের চারিদিকে অনেকখানি অন্ধকার, অনেক দুঃখ শোক, অনেক জ্বালাযন্ত্রণা শতকুটি কাঁথার মতো জড়িয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে—একা, একদিকে—আনন্দ থেকে দূরে, আলো থেকে দূরে। প্রাণ তার কাছ থেকে সরে পালাচ্ছে, গান তার সাড়া পেয়ে চুপ হয়ে যাচ্ছে, সুখ তার ত্রিসীমানায় আসছে না, সুন্দর তাকে দেখে ভয়ে মরছে! সকালের আলোর উপরে কালো ছায়া ফেলে অদন্তের বিকট হাসি হেসে পিশাচের মতো সেই মূর্তি সিদ্ধার্থের সামনে পথ আগলে বললে—'আমাকে দেখ, আমি জরা, আমার হাতে কারো নিস্তার নেই—আমি সব শুকিয়ে দিই, সব ঝরিয়ে দিই, সব শুষে নিই, সব লুটে নিই! আমাকে চিনে রাখ হে রাজকুমার! তোমাকেও আমার হাতে একদিন পড়তে হবে—রাজপুত্র বলে তুমি জরার হাত থেকে নিস্তার পাবে না।' দশদিকে সে একবার বিকট হাসি হেসে চেয়ে দেখলে অমনি আকাশের আলো, পৃথিবীর সবুজ তার দৃষ্টিতে এক নিমেষে মুছে গেল, খেত জ্বলে গেল, নদী শুকিয়ে গেল—নতুন যা কিছু পুরোনো হয়ে গেল, টাটকা যা কিছু বাসি হয়ে গেল। সিদ্ধার্থ দেখলেন—পাহাড় ধ্বসে পড়ছে, গাছ ভেঙে পড়ছে, সব ধুলো হয়ে যাচ্ছে, সব গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে—তার মাঝ দিয়ে চলে যাচ্ছে শাদা চুল বাতাসে উড়িয়ে, ছেঁড়া কাঁথা মাটিতে লুটিয়ে পায়ে-পায়ে গুটি-গুটি—অন্তহীন দন্তহীন বিকটমূর্তি জরা—সংসারের সব আলো নিবিয়ে দিয়ে, সব আনন্দ ঘুচিয়ে দিয়ে, সব শুষে নিয়ে, সব লুটে নিয়ে একলা হাড়ে-হাড়ে করতাল বাজিয়ে।

আর একদিন সিদ্ধার্থের সে মনোরথ—সিদ্ধার্থের সোনার রথ মৃদুমন্দ বাতাসে ধ্বজপতাকা উড়িয়ে দিয়ে কপিলবাস্তুর দক্ষিণ দুয়ার দিয়ে আস্তে-আস্তে বার হয়েছে। মলয় বাতাস কত ফুলের গন্ধ, কত চন্দনবনের শীতল পরশে ঠাণ্ডা হয়ে গায়ে লাগছে—সব তাপ, সব জ্বালা জুড়িয়ে দিয়ে! ফুল-ফোটানো মধুর বাতাস, প্রাণ

জুড়ানো দখিন বাতাস! কত দূরের মাঠে-মাঠে রাখালছেলের বাঁশির সুর, কত দূরের বনের বনে-বনে পাপিয়ার পিউগান সেই বাতাসে ভেসে আসছে—কানের কাছে, প্রাণের কাছে! সবাই বার হয়েছে, সবাই গেয়ে চলেছে—খোলা হাওয়ার মাঝে, তারার আলোর নিচে—দুয়ার খুলে, ঘর ছেড়ে! আকাশের উপরে ঠাণ্ডা নীল আলো, পৃথিবীর উপরে ঠাণ্ডা আলোছায়া, তার মাঝ দিয়ে বয়ে চলেছে মৃদুমন্দ মলয় বাতাস—ফুর-ফুরে দখিন বাতাস—জলে-স্থলে বনে-উপবনে ঘরে-বাইরে—সুখের পরশ দিয়ে, আনন্দের বাঁশি বাজিয়ে। সে বাতাসে আনন্দে বুক দুলে উঠছে, মনের পাল ভরে উঠছে। মনোরথ আজ ভেসে চলেছে নেচে চলেছে—সারি-গানের তালে-তালে সুখসাগরের থির, জলে। স্বপ্নের ফুলের মতো শুকতারাটি আকাশ থেকে চেয়ে রয়েছে—পৃথিবীর দিকে। সুখের আলো ঝরে পড়ছে, সুখের বাতাস ধীরে বইছে—পুবে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে। মনে হচ্ছে—আজ অসুখ যেন দূরে পালিয়েছে, অসোয়াস্তি যেন কোথাও নেই, জগৎসংসার সবই যেন, সবাই যেন আরামে রয়েছে, সুখে রয়েছে, শান্তিতে রয়েছে।



এমন সময় পর্দা সরিয়ে দিয়ে সুখের স্বপন ভেঙে দিয়ে সিদ্ধার্থের চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা পাঙাশ মূর্তি—জ্বরে জর্জর, রোগে কাতর। সে দাঁড়াতে পারছে না—ঘুরে পড়ছে। সে চলতে পারছে না—ধুলোর উপরে, কাদার উপরে শুয়ে রয়েছে। কখনো সে শীতে কাঁপছে, কখনো বা গায়ের জ্বালায় সে জল-জল করে চিৎকার করছে। তার সমস্ত গায়ের রক্ত তার চোখ-দুটো দিয়ে ঠিকরে পড়ছে। সেই চোখের দৃষ্টিতে আকাশ

আগুনের মতো রাঙা হয়ে উঠেছে। সমস্ত গায়ের রক্ত জল হয়ে তার কাগজের মতো পাঙাশ, হিম অঙ্গ বেয়ে ঝরে পড়ছে। তাকে ছুঁয়ে বাতাস বরফের মতো হিম হয়ে যাচ্ছে। সে নিশ্বাস টানছে যেন সমস্ত পৃথিবীর প্রাণকে শুষে নিতে চাচ্ছে। সে নিশ্বাস ছাড়ছে যেন নিজের প্রাণ, নিজের জ্বালা- যন্ত্রণা সারা সংসারে ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। সিদ্ধার্থ দেখলেন, সংসারের আলো নিবে গেছে, বাতাস মরে গেছে, সব কথা, সব গান চুপ হয়ে গেছে। কেবল ধুলো-কাদা মাখা জ্বরের সেই পাঙাশ মূর্তির বুকের ভিতর থেকে একটা শব্দ আসছে—কে যেন পাথরের দেয়ালে হাতুড়ি পিটছে—ধ্বক, ধ্বক! তারি তালে তালে আকাশের সব তারা একবার নিবছে একবার জ্বলছে, বাতাস একবার আসছে একবার যাচ্ছে।

জ্বরের সেই ভীষণ মূর্তি দেখে সিদ্ধার্থ ঘরে এসেছেন, রাজ-ঐশ্বর্যের মাঝে ফিরে এসেছেন, সুখসাগরের ঘাটে ফিরে এসেছেন, কিন্তু তখনো তিনি শুনছেন যেন তাঁর বুকের ভিতরে পাঁজরায়-পাঁজরায় ধাক্কা দিয়ে শব্দ উঠছে—ধ্বক, ধ্বক! এবার পশ্চিমের দুয়ার দিয়ে অস্তাচলের পথ দিয়ে পশ্চিমমুখে মনোরথ চলেছে—সোনার রথ চলেছে—যেদিকে দিন শেষ হচ্ছে, যেদিকে সূর্যের আলো অস্ত যাচ্ছে। সেদিক থেকে সবাই মুখ ফিরিয়ে চলে আসছে নিজের-নিজের ঘরের দিকে। পাখিরা ফিরে আসছে কলরব করে নিজের বাসায়—গাছের ডালে, পাতার আড়ালে। গাই-বাছুর সব ফিরে আসছে মাঠের ধার দিয়ে নদীর পার দিয়ে নিজের গোঠে, গোধূলির সোনার ধুলো মেখে। রাখালছেলেরা ফিরে আসছে গাঁয়ের পথে বেণু বাজিয়ে মাটির ঘরে মায়ের কোলে। সবাই ফিরে আসছে ভিন্‌গাঁয়ের হাট সেরে দূর পাটনে বিকিকিনির পরে। সবাই ঘরে আসছে—যারা দূরে ছিল তারা, যারা কাছে ছিল তারাও। ঘরের মাথায় আকাশপিদিম, যাদের ঘর নেই দুয়োর নেই তাদের আলো ধরেছে। তুলসীতলায় দুগ্‌গো পিদিম—যারা কাজে ছিল, কর্মে ছিল, যারা পড়া পড়ছিল, খেলা খেলছিল, তাদের জন্যে আলো ধরেছে। সবাই আজ মায়ের দুই চোখের মতো অনিমেষ দুটি আলোর দিকে চেয়ে-চেয়ে ফিরে আসছে মায়ের কোলে, ভাইবোনের পাশে, বন্ধু- বান্ধবের মাঝখানে।

ভিখারী যে সেও আজ মনের আনন্দে একতারায় আগমনী বাজিয়ে গেয়ে চলেছে 'এল মা ওমা ঘরে এল মা।' মিলনের শাঁখ ঘরে-ঘরে বেজে উঠেছে। আগমনীর সুর, ফিরে আসার সুর, বুকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুর, কোলে এসে গলা-ধরার সুর, আকাশ দিয়ে ছুটে আসছে, বাতাস দিয়ে ছুটে আসছে, খোলা দুয়োরে উঁকি মারছে, খালি ঘরে সাড়া দিচ্ছে।

শূন্য-প্রাণ, খালি-বুক ভরে উঠছে আজ ফিরে-পাওয়া সুরে, বুকে-পাওয়া সুরে, হারানিধি খুঁজে-পাওয়া সুরে!

সিদ্ধার্থ দেখছেন, সুখের আজ কোথাও অভাব নেই, আনন্দের মাঝে এমন-একটু ফাঁক নেই যেখান দিয়ে দুঃখ আজ আসতে পারে। ভরা নদীর মতো ভরপুর আনন্দ, পূর্ণিমার চাঁদের মতো পরিপূর্ণ আনন্দ জগৎ-সংসার আলোয় ভাসিয়ে, রসে ভরে দিয়েছে। আনন্দের বান এসেছে। আর কোথাও কিছু শুকনো নেই, কোনো ঠাঁই খালি নেই। সিদ্ধার্থ দেখতে-দেখতে চলেছেন মিলনের আনন্দ। ঝাঁকে ঝাঁকে দলে দলে আনন্দ আজ জোর করে দোর ঠেলে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, গলা জড়িয়ে ধরছে। কেউ আজ কাউকে ভুলে থাকছে না, ছেড়ে থাকছে না, ছেড়ে যাচ্ছে না, ছেড়ে দিচ্ছে না! আনন্দ কার নেই? আনন্দ নেই কোনখানে? কে আজ দুঃখে আছে, চোখের জল কে ফেলছে, মুখ শুকিয়ে কে বেড়াচ্ছে? যেন তাঁর কথার উত্তর দিয়ে কোন এক ভাঙা মন্দিরের কাঁসরে খন্‌খন্‌ করে তিনবার ঘা পড়ল—আছে, আছে, দুঃখ আছে! অমনি সমস্ত সংসারের ঘুম যেন ধাক্কা

দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে একটা বুক-ফাটা কান্না উঠল—হায় হায় হা হা! আকাশ ফাটিয়ে সে কান্না, বাতাস চিরে সে কান্না! বুকের ভিতরের বত্রিশ নাড়ি ধরে যেন টান দিতে থাকল—সে কান্না!

সিদ্ধার্থ সুখের স্বপ্ন থেকে যেন হঠাৎ জেগে উঠলেন!

আকাশের দিকে চেয়ে দেখলেন, সব কটি তারার আলো যেন মরা মানুষের চোখের মতো ঘোলা হয়ে গেছে! পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখলেন, রাত আড়াই পহরে জলে-স্থলে পাঙাশ কুয়াশার জাল পড়ে আসছে—কে যেন শাদা একখানা চাদর পৃথিবীর মুখ ঢেকে আস্তে-আস্তে টেনে দিচ্ছে। ঘরে-ঘরে যত পিদিম জ্বলছিল সবগুলো জ্বলতে-নিবতে, নিবতে-জ্বলতে, হঠাৎ এক সময় দপ করে নিবে গেল, আর জ্বলল না—কোথাও আর আলো রইল না। কিছু আর সাড়া দিচ্ছে না, শব্দ করছে না; আকাশের আধখানা-জুড়ে জলে-ভরা কালো মেঘ, কাঁদো-কাঁদো দু'খানি চোখের পাতার মতো নুয়ে পড়েছে। চোখের জলের মতো বৃষ্টির এক-একটি ফোঁটা ঝরে পড়ছে—আকাশ থেকে পৃথিবীর উপর! তারি মাঝ দিয়ে বুদ্ধদেব দেখছেন দলে দলে লোক চলেছে—শাদা চাদরে ঢাকা হাজার-হাজার মরা মানুষ কাঁধে নিয়ে, কোলে করে, বুকে ধরে। তাদের পা মাটিতে পড়ছে কিন্তু কোনো শব্দ করছে না, তাদের বুক ফুলে-ফুলে উঠছে বুকফাটা কান্নায়, কিন্তু কোনো কথা তাদের মুখ দিয়ে বার হচ্ছে না। নদীর পারে—যেদিকে সূর্য ডোবে, যেদিকে আলো নেবে, দিন ফুরিয়ে যায়—সেইদিকে দুই উদাস চোখ রেখে হনহন করে তারা এগিয়ে চলেছে মহা-শ্মশানের ঘাটের মুখে-মুখে, দূরে-দূরে, অনেক দূরে—ঘর থেকে অনেক দূরে, বুকের কাছ থেকে কোলের কাছ থেকে অনেক দূরে—ঘরে আসা, ফিরে আসা, বুকে আসা, কোলে আসার পথ থেকে অনেক দূরে—চলে যাবার পথে, ছেড়ে যাবার পথে, ফেলে যাবার, কাঁদিয়ে যাবার পথে।

এপারে ওপারে মরণের কান্না আর চিতার আগুন, মাঝ দিয়ে চলে যাবার পথ—কেঁদে চলে যাবার পথ, কাঁদিয়ে চলে যাবার পথ। থেকে-থেকে গরম নিশ্বাসের মতো এক-একটা দমকা বাতাসে রাশি-রাশি ছাই উড়ে এসে সেই মরণ-পথের যত যাত্রীর মুখে লাগছে, চোখে লাগছে! সিদ্ধার্থ দেখছেন ছাই উড়ে এসে মাথার চুল শাদা করে দিচ্ছে, গায়ের বরণ পাঙাশ করে দিচ্ছে! ছাই উড়ছে—সব জ্বালানো, সব-পোড়ানো গরম ছাই। আগুন নিবে ছাই হয়ে উড়ে চলেছে, জীবন ছাই হয়ে উড়ে চলেছে, মরণ সেও ছাই হয়ে উড়ে চলেছে। সুখ ছাই হয়ে উড়ে যাচ্ছে, দুঃখ ছাই হয়ে উড়ে যাচ্ছে, সংসারের যা-কিছু যত-কিছু সব ছাই-ভস্ম হয়ে উড়ে চলেছে দূরে-দূরে, মাথার উপরে খোলা আকাশ দিয়ে পাঙাশ একখানা মেঘের মতো। তারি তলায় বুদ্ধদেব দেখলেন—মরা ছেলেকে দুই হাতে তুলে ধরে এক মা একদৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে আছেন—বাতাস চারিদিকে কেঁদে বেড়াচ্ছে হায় হায় হায়রে হায়! সেদিন ঘরে এসে সিদ্ধার্থ দেখলেন, তাঁর সোনার পুষ্পপাত্রে ফুটন্ত ফুলটির জায়গায় রয়েছে একমুঠো ছাই, আর মরা-মানুষের আধপোড়া একখানা বুকের হাড়।

আজ সে বরফের হাওয়া ছুরির মতো বুকে লাগছিল। শীতের কুয়াশায় চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে গেছে—পৃথিবীর উপরে আর সূর্যের আলোও পড়ছে না, তারার আলোও আসছে না—দিনরাত্রি সমান বোধ হচ্ছে। ঝাপসা আলোতে সব রঙ বোধ হচ্ছে যেন কালো আর সাদা, সব জিনিস বোধ হচ্ছে যেন কতদূর থেকে দেখছি—অস্পষ্ট ধোঁয়া দিয়ে ঢাকা, শিশির দিয়ে মোছা!

উত্তরমুখে খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে সিদ্ধার্থ দেখছিলেন, পৃথিবীর সব সবুজ, সব পাতা, সব ফুল বরফে আর কুয়াশায় ঢাকা পড়েছে; বরফের চাপনে পথঘাট উঁচু-নিচু ছোট বড় সব সমান হয়ে গেছে! আকাশ দিয়ে আর

একটি পাখি উড়ে চলছে না, গেয়ে যাচ্ছে না; বাতাস দিয়ে আজ একটিও ফুলের গন্ধ, একটুখানি সুখের পরশ, কি আনন্দের সুর ভেসে আসছে না; শাদা বরফে, হিম কুয়াশায়, নিঝুম শীতে সব চুপ হয়ে গেছে, স্থির হয়ে গেছে, পাষাণ হয়ে গেছে—পৃথিবী যেন মূর্চ্ছা গেছে।

সিদ্ধার্থ দিনের পর দিন উত্তরের হিম কুয়াশায় শাদা বরফের মাঝে দাঁড়িয়ে ভাবছিলেন—কুয়াশার জাল সরিয়ে দিয়ে আলো কি আর আসবে না? বরফ গলিয়ে ফুল ফুটিয়ে পৃথিবীকে রঙে-রঙে ভরে দিয়ে সাজিয়ে দিয়ে আনন্দ কি আর দেখা যাবে না? চারিদিকে নিরুত্তর ছিল। সিদ্ধার্থ কান পেতে মন দিয়ে শুনছিলেন, কোনো দিক থেকে কোনো শব্দ আসছিল না। সেই না- রাত্রি-না-দিন, না-আলো-না-অন্ধকারের মাঝে কোনো সাড়া মিলছিল না। তিনি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। যতদূর দেখা যায় ততদূর তিনি দেখছিলেন বরফের দেয়াল আর কুয়াশার পর্দা; তারি ভিতর দিয়ে জরা উঁকি মারছে—শাদা চুল নিয়ে; জ্বর কাঁপছে—পাঙাশ মুখে শূন্যে চেয়ে; মরণ দেখা যাচ্ছে—বরফের মতো হিম শাদা চাদরে ঢাকা! আয়নায় নিজের ছায়া দেখার মতো, শাদা কাগজের উপরে নানা রকমের ছবি দেখার মতো সেই ঘন কুয়াশার উপরে সেই জমাট বরফের দেয়ালে সিদ্ধার্থ নিজেকে আর জগৎ-সংসারের সবাইকে দেখতে পাচ্ছেন—জন্মাতে, বুড়ো হতে, মরে যেতে; মহাভয় তাদের সবাইকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে রক্ত-মাখা ত্রিশূল হাতে! জ্বর, জরা আর মরা—তিনটে শিকারী কুকুরের মতো ছুটে চলেছে মহাভয়ের সঙ্গে-সঙ্গে, দাঁতে নখে যা-কিছু সব চিরে ফেলে, ছিঁড়ে ফেলে, টুকরো-টুকরো করে। কিছু তাদের আগে দাঁড়াতে পারছে না, কেউ তাদের কাছে নিস্তার পাচ্ছে না! নদীতে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ছে, ভয়ে নদী শুকিয়ে যাচ্ছে; পর্বতে এসে তারা ধাক্কা দিচ্ছে, পাথর চূর্ণ হয়ে মাটিতে মিশে যাচ্ছে। তারা মায়ের কোল থেকে ছেলেকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে—আগড় ভেঙে, শিকড় ছিঁড়ে। মহাভয়ের আগে রাজা-প্রজা। ছোট-বড় সব উড়ে চলছে—ধুলোর উপর দিয়ে শুকনো পাতার মতো। সবাই কাঁপছে ভয়ে, সব নুয়ে পড়ছে ভয়ে। সব মরে যাচ্ছে—সব নিবে যাচ্ছে—ঝড়ের আগে বাতাসের মুখে আলোর মতো। এক দণ্ড কিছু স্থির থাকতে পারছে না। আকাশ দিয়ে হাহাকার করে ছুটে আসছে ভয়, বাতাস দিয়ে মার-মার করে ছুটে আসছে ভয়, জলে-স্থলে ঘরে-বাইরে হানা দিচ্ছে ভয়—জ্বরের ভয়, জরার ভয়, মরণের ভয়! কোথায় সুখ? কোথায় শান্তি! কোথায় আরাম? সিদ্ধার্থ মনের ভিতর দেখছেন ভয়, চোখের উপর দেখছেন ভয়, মাথার উপর বজ্রঘাতের মতো ডেকে চলেছে ভয়, পায়ের তলায় ভূমিকম্পের মতো পৃথিবী ধরে নাড়া দিচ্ছে ভয়, প্রকাণ্ড জালের মতো চারিদিক ঘিরে নিয়েছে ভয়। সারা সংসার তার ভিতরে আকুলি-বিকুলি করছে। হাজার-হাজার হাত ভয়ে আকাশ আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করছে, বাতাসে কেবলি শব্দ উঠছে রক্ষা কর! নিস্তার কর! কিন্তু কে রক্ষা করবে? কে নিস্তার করবে? ভয়ের জাল যে সারা সংসারকে ঘিরে নিয়েছে! এমন কে আছে যার ভয় নেই, কে এমন যার দুঃখ নেই, শোক নেই, এত শক্তি কার যে মহাভয়ের হাত থেকে জগৎ-সংসারকে উদ্ধার করে—এই অটুট মায়াজাল ছিঁড়ে? সিদ্ধার্থের কথার যেন উত্তর দিয়ে আকাশে-বাতাসে, জলে-স্থলে, পুবে-পশ্চিমে, উত্তরে-দক্ষিণে শব্দ উঠল—বিদ্ধা মহিদ্ধিকা—মহাশক্তি বুদ্ধগণ! সদেবকসস লোকস্‌স সব্বে এতে পরায়ণা।

দীপা, নাথা পতিষ্ঠা, চ তাণা লেণা চ পাণীনং।
গতি, বন্ধু, মহাস্‌সাসা, সরণা চ হিতেসিনো।।
মহাপ্পভা, মহাতেজা, মহাপঞ্ঞা, মহাব্বলা।

মহা কারুণিকা ধীরা সব্বেসানং সুখাবহা।।

বুদ্ধগণই ত্রিলোকের লোককে পরম পথে নিয়ে চলেন। মহাপ্রভু, মহাতেজ, মহাজ্ঞানী, মহাবল, ধীর করুণাময় বুদ্ধগণ সকলকেই সুখ দেন। জগতের হিতৈষী তাঁরা অকূলের কূল, অনাথের নাথ, সকলের নির্ভর, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, অগতির গতি, যার কেউ নেই তার বন্ধু, যে হতাশ তার আশা, অশরণ যে তার শরণ।

দেখতে-দেখতে সিদ্ধার্থের চোখের সামনে থেকে—মনের উপর থেকে জগৎজোড়া মহাভয়ের ছবি আলোর আগে অন্ধকারের মতো মিলিয়ে গেল। তিনি দেখলেন, আকাশের কুয়াশা আলো হয়ে পৃথিবীর উপর এসে পড়েছে। সেই আলোয় বরফ গলে চলেছে—পৃথিবীকে সবুজে-সবুজে পাতায়-পাতায় ফুলে-ফুলে ভরে দিয়ে। সেই আলোতে আনন্দ আবার জেগে উঠেছে। পাখিদের গানে-গানে বনে-উপবনে সেই আলো। বাহিরে বাঁশি হয়ে বেজে উঠছে, অন্তরে সুখ হয়ে উথলে পড়েছে, শান্তি হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে—সেই আলো। ত্রিভুবনে—স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে—সেই আলো আনন্দের পথ খুলে দিয়েছে, শান্তির সাতরঙের ধ্বজা উড়িয়ে দিয়েছে। সেই আলোর পথ দিয়ে সিদ্ধার্থ দেখলেন, চলেছেন—সে তিনি নিজেই! তাঁর খালি পা, খোলা মাথা। তাঁর ভয় নেই, দুঃখ নেই, শোক নেই। সদানন্দ তিনি বরফের উপর দিয়ে কুয়াশার ভিতর দিয়ে আনন্দে চলেছেন, নির্ভয়ে চলেছেন—সবাইকে অভয় দিয়ে, আনন্দ বিলিয়ে। মহাভয় তাঁর পায়ের কাছে কাঁপছে একটুখানি ছায়ার মতো! মায়াজাল ছিঁড়ে পড়েছে তাঁর পায়ের তলায়—যেন খণ্ড-খণ্ড মেঘ!

যেমন আর-দিন, সেদিনও তেমনি—রথ ফিরিয়ে সিদ্ধার্থ ঘরে এলেন বটে কিন্তু সেইদিন থেকে মন তাঁর সে রাজমন্দিরে, সেই মায়া-জালে-ঘেরা সোনার-স্বপনে-মোড়া ঘরখানিতে আর বাঁধা রইল না। সে উদাসী হয়ে চলে গেল—ঘর ছেড়ে চলে গেল—কত অনামা নদীর ধারে-ধারে কত অজানা দেশের পথে-পথে—একা নির্ভয়।

সন্ধ্যাতারার সঙ্গে-সঙ্গে ফুটন্ত ফুলের মতো নতুন ছেলের কচি মুখ, নতুন মা হয়েছেন সিদ্ধার্থের রাণী যশোধরা—তাঁর সুন্দর মুখের মধুর হাসি, সহচরীদের আনন্দ গান, কপিলবাস্তুর ঘরে-ঘরে সাত রঙের আলোর মালা কিছুতে আর সিদ্ধার্থের মনকে সংসারের দিকে ফিরিয়ে আনতে পারলে না—সে রইল না, সে রইল না। ছেলে হয়েছে; এবার সিদ্ধার্থ সংসার পেতে ঘরে রইলেন—এই ভেবে শুদ্ধোদন নতুন ছেলের নাম রাখলেন রাহুল। কিন্তু সিদ্ধার্থের মন সংসারে রইল কই? রাহুল রইল, রইল রাহুলের মা যশোধরা, পড়ে রইল ঘরবাড়ি বন্ধুবান্ধব। আর সব আঁকড়ে পড়ে রইলেন রাজা শুদ্ধোদন, কেবল চলে গেলেন সিদ্ধার্থ—তাঁর মন যে-দিকে গেছে।

সেদিন আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা। রাত তখন গভীর। রাজপুরে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আলো নিবিয়ে গান থামিয়ে সিদ্ধার্থ ডাকলেন—'ছন্দক, আমার ঘোড়া নিয়ে এস। সিদ্ধার্থের চরণের দাস ছন্দক, কণ্ঠক ঘোড়াকে সোনার সাজ পরিয়ে অর্ধেক রাতে রাজপুরে নিয়ে এল। সিদ্ধার্থ সেই ঘোড়ায় চড়ে চলে গেলেন—অনামা নদীর পারে! পিছনে অন্ধকারে ক্রমে মিলিয়ে গেল—কপিলবাস্তুর রাজপুরী; সামনে দেখা গেল—পূর্ণিমার আলোয় আলোময় পথ!

ছন্দক চলেছে কপিলবাস্তুর দিকে—সিদ্ধার্থের মাথার মুকুট, হাতের বালা, গলার মালা, কানের কুণ্ডল আর সেই কণ্ঠক ঘোড়া নিয়ে; আর সিদ্ধার্থ চলেছেন পায়ে হেঁটে, নদী পার হয়ে, বনের দিকে তপস্যা করতে—

দুঃখের কোথা শেষ তাই জানতে।

ছোট নদী—দেখতে এতটুকু, নামটিও তার মা; কেউ বলে অনামা, কেউ বলে অনোমা, কেউ বা ডাকে অনমা। সিদ্ধার্থ নদীর যে-পার থেকে নামলেন সে-পারে ভাঙন জমি—সেখানে ঘাট নেই, কেবল পাথর আর কাঁটা। আর যে-পারে সিদ্ধার্থ উঠলেন সে-পারে ঘাটের পথ ঢালু হয়ে একেবারে জলের ধারে নেমে এসেছে; গাছে-গাছে ছায়া-করা পথ। সবুজ ঘাস, বনের ফুল দিয়ে সাজানো বনপথ। এই দুই পারের মাঝে নমা নদীর জল—বালি ধুয়ে ঝির-ঝির করে বহে চলেছে। একটা জেলে ছোট একখানি জাল নিয়ে মাছ ধরছে। সিদ্ধার্থ নিজের গায়ের সোনার চাদর সেই জেলেকে দিয়ে তার ছেঁড়া কাঁথাখানি নিজে পরে চলেছেন।



নদী—সে ঘুরে-ঘুরে চলেছে আম-কাঁঠালের বনের ধার দিয়ে, ছোট-ছোট পাহাড়ের গা ঘেঁষে—কখনো পুব মুখে, কখনো দক্ষিণ মুখে। সিদ্ধার্থ চলেছেন সেই নদীর ধারে-ধারে ছাওয়ায়-ছাওয়ায়, মনের আনন্দে। এমন সে-সবুজ ছাওয়া, এমন সে জলের বাতাস যে মনে হয় এইখানেই থাকি। ফলে ভরা, পাতায় ঢাকা জামগাছ, একেবারে নদীর উপর ঝুঁকে পড়েছে; তারি তলায় ঋষিদের আশ্রম। সেখানে সাত দিন, সাত রাত্রি কাটিয়ে

সিদ্ধার্থ বৈশালী নগরে এলেন। সেখানে জটাধারী মহাপণ্ডিত আরাড় কালাম, নগরের বাইরে তিনশো চেলা নিয়ে, আস্তানা পেতে বসেছেন। সিদ্ধার্থ তাঁর কাছে শাস্ত্র পড়লেন, ধ্যান, আসন, যোগ-যাগ, মন্তর-তন্তর কতই শিখলেন কিন্তু দুঃখকে কিসে জয় করা যায় তার সন্ধান পেলেন না। তিনি আবার চললেন। চারিদিকে বিন্ধ্যাচল পাহাড়; তার মাঝে রাজগেহ নগর। মগধের রাজা বিম্বিসার সেখানে রাজত্ব করেন। সিদ্ধার্থ সেই নগরের ধারে রত্নগিরি পাহাড়ের একটি গুহায় আশ্রয় নিলেন। তখন ভোর হয়ে আসছে, সিদ্ধার্থ পাহাড় থেকে নেমে নগরের পথে 'ভিক্ষা দাও' বলে এসে দাঁড়ালেন; ঘুমন্ত নগর তখন সবে জেগেছে, চোখ মেলেই দেখছে—নবীন সন্ন্যাসী! এত রূপ, এমন করুণামাখা হাসিমুখ, এমন আনন্দ দিয়ে গড়া সোনার শরীর, এমন শান্ত দুটি চোখ নিয়ে, এমন করে এক হস্তে অভয় দিয়ে, অন্য হাতে ভিক্ষে চেয়ে, চরণের ধুলোয় রাজপথ পবিত্র করে কেউ তো কোনোদিন সে নগরে আসেনি। যারা চলেছিল তাঁকে দেখে তারা ফিরে আসছে; ছেলে খেলা ফেলে তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে আছে; মেয়েরা ঘোমটা খুলে তাঁরদিকে চেয়ে আছে! তাঁকে দেখে কারো ভয় হচ্ছে না, লজ্জা করছে না। রাজা বিম্বিসার রাজপথে এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁকে দেখতে! কত সন্ন্যাসী ভিক্ষা করতে আসে কিন্তু এমনটি তো কেউ আসে না। রাজপথের এপার-থেকে-ওপার লোক দাঁড়িয়েছে—তাঁকে দেখতে, তাঁর হাতে ভিক্ষে দিতে, দোকানী চাচ্ছে দোকান লুটিয়ে দিয়ে তাঁকে ভিক্ষে দিতে, পসারী চাচ্ছে পসরা খালি করে দিয়ে তাঁকে ভিক্ষে দিতে! যে নিজে ভিখারী সেও তার ভিক্ষার ঝুলি শূন্য করে তাঁকে বলছে—ভিক্ষে নাও গো, ভিক্ষে নাও! ভিক্ষেয় সিদ্ধার্থের দুই হাত ভরে গেছে কিন্তু ভিক্ষে দিয়ে তখনো লোকের মন ভরেনি! তারা মণিমুক্তো সোনারুপো ফুলফল চালডাল স্তূপাকারে এনে সিদ্ধার্থের-পায়ের কাছে রাখছে, তারা নিষেধ মানবে না, মানা শুনবে না।

রাজা-প্রজা ছোট-বড়—সকলের মনের সাধ পুরিয়ে সিদ্ধার্থ সেদিন রাজগেহের দ্বারে-দ্বারে পথে-পথে এমন করে ভিক্ষে নিলেন যে তেমন ভিক্ষে কেউ কোনোদিন দেবেও না, পাবেও না। এত মণিমুক্তো সোনারুপো বসন-ভূষণ সিদ্ধার্থের দুই হাত ছাপিয়ে রাজগেহের রাস্তায়-রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছিল যেতত ঐশ্বর্য কোনো রাজা কোনো দিন চোখেও দেখেনি। সিদ্ধার্থ নিজের জন্য কেবল এক-মুঠো শুকনো ভাত রেখে সেই অতুল ঐশ্বর্য মগধের যত দীনদুঃখীকে বিতরণ করে চলে গেলেন। উদরক পণ্ডিত সাতশো চেলা নিয়ে গয়ালী পাড়ায় চৌপাটি খুলে বসেছেন। সিদ্ধার্থ সেখানে এসে পণ্ডিতদের কাছে শাস্তর শিখতে লাগলেন। উদরকের মতো পণ্ডিত তখন ভূভারতে কেউ ছিল না। লোকে বলত ব্যাসদেবের মাথা আর গণেশের পেট—এই দুইটি এক হয়ে অবতার হয়েছেন উদরক শাস্ত্রী। সিদ্ধার্থ কিছুদিনেই সকল শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হয়ে উঠলেন, কোনো ধর্ম কোনো শাস্ত্র জানতে আর বাকি রইল না। শেষে একদিন, তিনি গুরুকে প্রশ্ন করলেন—'দুঃখ যায় কিসে?' উদরক সিদ্ধার্থকে বললেন—'এস, তুমি আমি দুজনে একটা বড়গোছের চৌপাটি খুলে চারিদিকে সংবাদ পাঠাই, দেশবিদেশ থেকে ছাত্র এসে জুটুক, বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটবে। এই পেটই হচ্ছে দুঃখের মূল, একে শান্ত রাখ, দেখবে দুঃখ তোমার ত্রিসীমানায় আসবে না।'

উদরক শাস্ত্রীকে দূর থেকে নমস্কার করে সিদ্ধার্থ চৌপাটি থেকে বিদায় হলেন। দেখলেন, গ্রামের পথ দিয়ে উদরকের সাতশো চেলা ভারে-ভারে মোণ্ডা নিয়ে আসছে—গুরুর পেটটি শান্ত রাখতে।

সিদ্ধার্থ গ্রামের পথ ছেড়ে, বনের ভিতর দিয়ে চললেন। এই বনের ভিতর কৌণ্ডিন্যের সঙ্গে সিদ্ধার্থের দেখা। ইনিই একদিন শুদ্ধোদন রাজার সভায় গুণে বলেছিলেন, সিদ্ধার্থ নিশ্চয়ই সংসার ছেড়ে বুদ্ধ হবেন।

কৌণ্ডিন্যের সঙ্গে আর চারজন ব্রাহ্মণের ছেলে ছিল। তাঁরা সবাই সিদ্ধার্থের শিষ্য হয়ে তাঁর সেবা করবার জন্য সন্ন্যাসী হয়ে কপিলবাস্তু থেকে চলে এসেছেন।

অঞ্জনা নদীর তীরে উরাইল বন। সেইখানেই সিদ্ধার্থ তপস্যায় বসলেন—দুঃখের শেষ কোথায় তাই জানতে। শাস্ত্রে যেমন লিখেছে, গুরুরা যেমন বলেছেন, তেমনি করে বছরের পর বছর ধরে সিদ্ধার্থ তপস্যা করছেন। কঠোর তপস্যা—ঘোরতর তপস্যা—শীতে গ্রীষ্মে বর্ষায় বাদলে অনশনে একাসনে এমন তপস্যা কেউ কখনো করেনি! কঠোর তপস্যায় তাঁর শরীর শুকিয়ে কাঠের মতো হয়ে গেল, গায়ে আর এক বিন্দু রক্ত রইল না—দেখে আর বোঝা যায় না তিনি বেঁচে আছেন কিনা!

সিদ্ধার্থের কত শক্তি ছিল, কত রূপ ছিল, কত আনন্দ কত তেজ ছিল, ঘোরতর তপস্যায় সব একে-একে নষ্ট হয়ে গেল। তাঁকে দেখলে মানুষ বলে আর চেনা যায় না—যেন একটা শুকনো গাছের মতো দাঁড়িয়ে আছেন। এমনি করে অনেকদিন কেটে গেছে। সেদিন নতুন বছর, বৈশাখ মাস, গাছে-গাছে নতুন পাতা, নতুন ফল, নতুন ফুল। উরাইল বনে যত পাখি, যত প্রজাপতি, যত হরিণ, যত ময়ূর সব যেন আজ কিসের আনন্দে জেগে উঠেছে, ছুটে বেড়াচ্ছে, উড়ে-উড়ে গেয়ে-গেয়ে খেলে বেড়াচ্ছে। সিদ্ধার্থের পাঁচ শিষ্য শুনতে পাচ্ছেন খুব গভীর বনের ভিতরে যেন কে-একজন একতারা বাজিয়ে গান গাইছে। সারাবেলা ধরে আজ অনেক দিন পরে শিষ্যরা দেখছেন সিদ্ধার্থের স্থির দুটি চোখের পাতা একটু-একটু কাঁপছে—বাতাসে যেন শুকনো ফুলের পাঁপড়ি। বেলা পড়ে এসেছে; গাছের ফাঁক দিয়ে শেষ-বেলার সিঁদুর আলো নদীর ঘাট থেকে বনের পথ পর্যন্ত বিছিয়ে গেছে—গেরুয়া বসনের মতো।

একদল হরিণ বালির চড়ায় জল খেতে নেমেছে, গাছের তলায় একটা ময়ূর ঠাণ্ডা বাতাসে আপনার সব পালক ছড়িয়ে দিয়ে সন্ধ্যার আগে প্রাণ ভরে একবার নেচে দিচ্ছে। সেইসময় সিদ্ধার্থ চোখ মেলে চাইলেন—শিষ্যেরা দেখলেন, তাঁর শরীর এমন দুর্বল যে তিনি চলতে পারছেন না। নদীর পারে একটা আমলকী গাছ জলের উপর ঝুঁকে পড়েছিল, সিদ্ধার্থ তারি একটা ডাল ধরে আস্তে-আস্তে জলে নামলেন। তারপর অতি কষ্টে জল থেকে উঠে গোটা কয়েক আমলকী ভেঙে নিয়ে বনের দিকে চলবেন আর অচেতন হয়ে নদীর ধারে পড়ে গেলেন। শিষ্যেরা ছুটে এসে তাঁকে ধরাধরি করে আশ্রমে নিয়ে এল। অনেক যত্নে সিদ্ধার্থ সুস্থ হয়ে উঠলেন। কৌণ্ডিন্য প্রশ্ন করলেন—'প্রভু, দুঃখের শেষ হয় কিসে জানতে পারলেন কি?' সিদ্ধার্থ ঘাড় নেড়ে বললেন, 'না—এখনো না।' অন্য চার শিষ্য, তাঁরা বললেন—'প্রভু তবে আর-একবার যোগাসনে বসুন, জানতে চেষ্টা করুন—দুঃখের শেষ আছে কিনা। সিদ্ধার্থ চুপ করে রইলেন। কিন্তু শিষ্যদের কথার উত্তর দিয়েই যেন একটা পাগলা বনের ভিতর থেকে একতারা বাজিয়ে গেয়ে উঠল—'নারে! নারে! নাইরে নাই!'

কৌণ্ডিন্য বললেন—'জানবার কি কোনো পথ নেই প্রভু?'

সিদ্ধার্থ বললেন—'পথের সন্ধান এখনো পাইনি, কিন্তু দেখ তার আগেই এই শরীর দুর্বল হয়ে পড়ল, বৃথা যোগেযাগে নষ্ট হবার মতো হল। এখন এই শরীরে আবার বল ফিরিয়ে আনতে হবে, তবে যদি পথের সন্ধান করে ওঠা যায়। নিস্তেজ মন, দুর্বল শরীর নিয়ে কোনো কাজ অসম্ভব। শরীর সবল রাখ, মনকে সতেজ রাখ। বিলাসীও হবে না, উদাসীও হবে না। শরীর মনকে বেশী আরাম দেবে না, বেশি কষ্টও সহাবে না, তবেই সে সবল থাকবে, কাজে লাগবে, পথের সন্ধানে চলতে পারবে। একতারার তার যেমন জোরে টানলে ছিঁড়ে যায়, তেমনি বেশি কষ্ট দিলে শরীর মন ভেঙে পড়ে। যেমন তারবে একবার ঢিলে দিলে তাতে কোনো সুরই বাজে

না, তেমনি শরীর মনকে আরাম আলস্যে ঢিলে করে রাখলে সে নিষ্কর্মা হয়ে থাকে। বৃথা যোগেযাগে শরীর মনকে নিস্তেজ করেও লাভ নেই, বৃথা আলস্য বিলাসে তাকে নিষ্কর্মা বসিয়ে রেখেও লাভ নেই—মাঝের পথ ধরে চলাই ঠিক।'

সেদিন থেকে শিষ্যরা দেখলেন, সিদ্ধার্থ সন্ন্যাসীদের মতো ছাইমাখা, আসন-বেঁধে বসা, ন্যাস কুম্ভক তপজপ ধুনী ধুনচি সব ছেড়ে দিয়ে আগেকার মতো গ্রামে-গ্রামে ভিক্ষা করে দিন কাটাতে লাগলেন। কেউ নূতন কাপড় দিলে তিনি তাই পরেন, কেউ ভালো খাবার দিলে তিনি তাও খান। শিষ্যদের সেটা মনোমতো হল না।



তাদের বিশ্বাস যোগী হতে হলেই গরমের দিনে চারিদিকে আগুন জ্বালিয়ে, শীতের দিনে সারারাত জলে পড়ে —কখনো উর্ধ্ববাহু হয়ে দুই-হাত আকাশে তুলে কখনো হেঁটমুণ্ড হয়ে দুই-পা গাছের ডালে বেঁধে থাকতে হয়। প্রথমে দিনের মধ্যে একটি কুল, তারপর সারাদিনে একটি বেলপাতা, ক্রমে একফোঁটা জল, তারপর তাও

নয়—এমনি করে যোগসাধন না করলে কোনো ফল পাওয়া যায় না। কাজেই সিদ্ধার্থকে একলা রেখে একদিন রাত্রে তারা কাশীর ঋষিপত্তনের দিকে চলে গেল—সিদ্ধার্থের চেয়ে বড় ঋষির সন্ধানে।

শিষ্যরা যেখানে সিদ্ধার্থকে একা ফেলে চলে গেছে—উরাইল বনের সেদিকটা ভারি নির্জন। ঘন-ঘন শাল-বন সেখানটা দিনরাত্রি ছায়া করে রেখেছে। মানুষ সেদিকে বড় একটা আসে না; দু-একটা হরিণ আর দু-দশটা কাঠবিড়ালি শুকনো শাল-পাতা মাড়িয়ে খুসখাস চলে বেড়ায় মাত্র।

এই নিঃসাড়া নিরালা বনটির গা দিয়েই গাঁয়ে যাবার ছোট রাস্তাটি অঞ্জনার ধারে এসে পড়েছে। নদীর ধারেই একটি প্রকাণ্ড বটগাছ—সে যে কতকালের তার ঠিক নেই। তার মোটা-মোটা শিকড়গুলো উচুঁ পাড় বেয়ে অজগর সাপের মতো সটান জলের উপর ঝুলে পড়েছে। গাছের গোড়াটি কালো পাথর দিয়ে চমৎকার করে বাঁধানো। লোকে দেবতার স্থান বলে সেই গাছকে পূজা দেয়। ফুল-ফলের নৈবেদ্য সাজিয়ে নদীর ওপারে গ্রাম থেকে মেয়েরা যখন খুব ভোরে নদী পার হয়ে এদিকে আসে, তখন কোনো-কোনো দিন তারা যেন দেখতে পায় গেরুয়া-কাপড়-পরা কে একজন গাছতলায় বসেছিলেন, তাদের দেখেই অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন! কাঠুরেরা কোনো-কোনো দিন কাঠ কেটে বন থেকে ফিরে আসতে দেখে, গাছের তলা আলো করে সোনার কাপড়-পরা দেবতার মতো এক পুরুষ! সবাই বলত, নিশ্চয় ওখানে দেবতা থাকেন! কিন্তু দেবতাকে স্পষ্ট করে কেউ কোনো দিন দেখেনি—পুন্না ছাড়া। মোড়লের মেয়ে সুজাতা বিয়ের পরে একদিন ওই বটগাছের তলায় পূজা দিতে গিয়ে পুন্নাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। সেই থেকে সে মোড়লের ঘরে আর-একটি মেয়ের সমান মানুষ হয়েছে। এখন তার বয়স দশ বছর। সুজাতার ছেলে হয়নি, তাই তিনি পুন্নাকে মেয়ের মতো যত্ন করে মানুষ করেছেন। আর মানত করেছেন যদি ছেলে হয় তবে এক-বছর বটতলায় রোজ ঘিয়ের পিদিম নিয়ে নতুন বছরের পূর্ণিমায় ভালো করে বটেশ্বরকে পুজো দেবেন। সুজাতার ঠাকুর সুজাতাকে একটি সোনারচাঁদ ছেলে দিয়েছিলেন, তাই পুন্না রোজ সন্ধ্যাবেলা একটি ঘিয়ের পিদিম দিতে এই বটতলায় আসে। আজ এক-বছর সে আসছে, কোনো দেবতাকে কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পায়নি। কখনো সে আসবার আগেই ছায়ার মতো দেবতার মূর্তি মিলিয়ে যেত, কখনো বা সে-গাছের তলায় পিদিমটি রেখে যখন একলা, পায়ে হেঁটে নদী পার হয়ে ফিরে চলেছে, তখন দেখত যেন দেবতা এসে সেই পাথরের বেদীর উপরে বসেছেন!

আজ শীতের ক'মাস ধরে পুন্না ছায়ার মতো—যেন পাতলা কুয়াশার ভিতর দিয়ে দেবতাকে দেখেছে। এ-কথা সে সুজাতাকে বলেছিল—আর কাউকে না। সুজাতা সেইদিন থেকে পুন্নাকে দেবতার জন্যে আঁচলে বেঁধে দুটি করে ফল নিয়ে যেতে বলে দিয়েছিলেন। আর বলে দিয়েছিলেন, যদি দেবতা কোনোদিন স্পষ্ট করে দেখা দেন, কি কথা কন তবে যেন পুন্না বলে—দেবতা! আমার সুজাতা-মাকে, আমার বাবাকে, আমার ছোট ভাইটিকে আর আমার মোড়লদাদাকে ভালো রেখ। বড় হলে আমি যেন একটি সুন্দর বর পাই। এমনি করে পুন্নার হাত দিয়ে সুজাতা দুটি ফল সেই বটতলায় পাঠিয়ে দিতেন। তিনিও জানতেন না, পুন্নাও জানত না যে সিদ্ধার্থ রোজ সন্ধ্যাবেলা সেই বটতলায় ঠাণ্ডা পাথরের বেদীটির উপরে এসে বসেন।

আজ বছরের শেষ; কাল নতুন বছরের পূর্ণিমা। পুন্না আজ সকাল করে পাঁচটি পিদিম, পাঁচটি ফল থালায় সাজিয়ে একটি নিজের নামে, একটি ভায়ের নামে, একটি মায়ের নামে, একটি বাপের নামে, একটি মোড়লদাদার নামে সেই বটগাছের তলায় সাজিয়ে রাখছে। বিকেল-বেলায় সোনার আলো বটগাছটির তলাটিতে এসে লেগেছে। রোদে-পোড়া বালির চড়ায় জলের দাগ টেনে বয়ে চলেছে অঞ্জনা নদীটি। ওপারে

দেখা যাচ্ছে অনেক দূর পর্যন্ত ধানের খেত, আর মাঝে-মাঝে আম-কাঁঠালের বাগান-ঘেরা ছোট-ছোট গ্রামগুলি। মাটির ঘর, খড়ের চাল, একটা পাহাড়—সে কত দূরে দেখা যাচ্ছে মেঘের মতো। নদীর ওপারেই মেঠো রাস্তা—সবুজ শাড়ির শাদা পাড়ের মতো সরু, সোজা। সেই রাস্তায় চাষার মেয়েরা চলেছে ঘাসের বোঝা মাথায় নিয়ে। তাদের পরনে রাঙা শাড়ি, হাতে রুপোর চুড়ি, পিঠের উপর ঝুলি-বাঁধা কচি ছেলেটি ঘুমিয়ে আছে হাত-দুটি মুঠো করে। একটুখানি ঠাণ্ডা বাতাস নদীর দিক থেকে মুখে এসে লাগল। একটা চিল অনেক উঁচু থেকে ঘুরতে-ঘুরতে আস্তে-আস্তে একটা গাছের ঝোপে নেমে গেল।

পুন্না দেখছে, বেলা পড়ে এসেছে। বালির উপর দিয়ে চলে আসছে অনেকগুলো কালো মোষ—একটার পিঠে মস্ত-একগাছ লাঠি-হাতে বসে রয়েছে গোয়ালাদের ছেলেটা। সে রোজ সন্ধ্যাবেলা মোষের পিঠে চড়িয়ে পুন্নাকে মোড়লদের বাড়ি পৌছে দেয়! আজও তাই আসছে। অনেক দূর থেকে সে ডাক দিচ্ছে 'আরে রে পুন্না রে!' ছেলেটার নাম সোয়াস্তি। পুন্না তার গলা পেয়েই তাড়াতাড়ি পিদিম-পাচঁটা জ্বালিয়ে দিয়েই যেদিক দিয়ে সোয়াস্তি আসছিল সেই দিকে চলে গেল। তখন একখানি সোনার থালার মতো পুবদিকে চতুর্দশীর চাঁদ উঠেছে। পুন্না আর সোয়াস্তি মোষের পিঠে চড়ে বালির চড়া দিয়ে চলেছে। উঁচু পাড়ের উপর বটতলাতে ঝিকঝিক করছে পুন্নার-দেওয়া পিদিমের আলো। সেই আলোয় সোয়াস্তি, পুন্না—দুজনেই আজ স্পষ্ট দেখলে গেরুয়া-বসন-পরা দেবতা এসে গাছের তলায় বসেছেন—পাথরের বেদীটিতে।



পুন্নাকে তাদের বাড়ির দরজায় নামিয়ে দিয়ে সোয়াস্তি চলে গেল। সুজাতা তখন গরু-বাছুর গোয়ালে বেঁধে ছেলেটিকে ঘুম পাড়িয়ে সকালের জন্যে পুজোর বাসন গুছিয়ে রাখছেন। পুন্না এসে বললে –'মা, আজ সত্যি দেবতাকে দেখেছি। কাল খুব ভোরে উঠে যদি তুমি সেখানে যেতে পার তো তুমিও দেখতে পাবে। সোয়াস্তি আমি দুজনেই দেখেছি। কিন্তু ঠাকুরের কাছে কিছু চেয়ে নিতে ভুলে গেলুম মা।'

সুজাতা বললেন—'যদি মনে পড়ত তবে কি চাইতিস পুন্না? সোয়াস্তির সঙ্গে তোর বিয়ে হোক—এই বুঝি?' পুন্না তখন পালিয়েছে। সুজাতা পুজোর সমস্ত গুছিয়ে রেখে যখন ঘরে গেলেন, পুন্না তখন ছোট ভাইটির পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সুজাতার চোখে আজ ঘুম নেই। রাত-থাকতে তিনি পুন্নাকে ডেকে তুলেছেন। পুন্না গোয়ালের দরজা খুলে এককোণে একটি পিদিম জ্বালিয়ে গরুগুলিকে দুইতে বসেছে। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় গরুগুলির শীত লেগেছে, তারা একটু ভয় খেয়েছে, চঞ্চল হয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখছে—এত রাত্রে কে দুধ নিতে এল? কিন্তু পুন্না যেমন তাদের পিঠে বাঁ হাতটি বুলিয়ে নাম ধরে ডাকছে অমনি তারা স্থির হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সুজাতা উঠোনের এককোণে একটি উনুন জ্বালিয়ে দিয়ে কুয়োর জলে স্নান করতে গেলেন। পুন্না দুধটুকু দুয়ে একটি ধোয়া কড়ায় সেই উনুনের উপরে চাপিয়ে দিলে—দুধ টগবগ করে ফুটতে লাগল। সুজাতা ধোয়া কাপড় পরে পুন্নাকে এসে বললেন—তুই গোটা কতক ফুল তুলে আন, আমি দুধ জ্বাল দিচ্ছি।'

মোড়লদের বাড়ির ধারেই বাগান; সেখানে গাঁদা ফুল অনেক। পুন্না সেই ফুলে একটা মালা গেঁথে বটের পাতায় একটু তেল-সিঁদুর পুজোর থালায় সাজিয়ে রেখে সুজাতাকে ডাকছে—'মা, চল, আর দেরি করলে সকাল হয়ে যাবে; দেবতাকে দেখতে পাবে না।'

সুজাতা জ্বাল-দেওয়া টাটকা দুধটুকু একটি নতুন ভাঁড়ে ঢেলে পুন্নার হাতে দিয়ে বললেন—'তুই এইটে নিয়ে চল, আমি পুজোর থালা আর মনুয়াকে সঙ্গে নিয়ে যাই।' সুজাতার ছেলের নাম মনুয়া।

ভোরের অন্ধকারে গাঁয়ের পথ একটু-একটু দেখা যাচ্ছে। পুন্না চলেছে আগে-আগে দুধের ভাঁড় নিয়ে ঝুমুর-ঝুমুর মল বাজিয়ে, সুজাতা চলেছেন পিছনে-পিছনে ছেলে-কোলে পুজোর থালাটি ডান হাতে নিয়ে। পুন্নার সঙ্গে একলা যেতে সুজাতার একটু-একটু ভয় করছিল। সোয়াস্তিদের বাড়ির কাছে এসে সুজাতা বললেন—'ওরে সোয়াস্তিকে ডেকে নে না!' সোয়াস্তিকে আর ডাকতে হল না, সে পুন্নার পায়ের শব্দ পেয়েই একটা লাঠি আর একটা আলো নিয়ে বেরিয়ে এল। তিনজনে মাঠ ভেঙে চলেছেন। তখনো আকাশে তারা দেখা যাচ্ছে—রাত পোহাতে অনেক দেরি কিন্তু এরি মধ্যে সকালের বাতাস পেয়ে গাঁয়ের উপর থেকে সারা রাতের জমা ঘুঁটের ধোঁয়া শাদা একখানি চাঁদোয়ার মতো ক্রমে-ক্রমে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। উলু-বনের ভিতর দু-একটা তিতির, বকুলগাছে দু-একটা শালিক এরি মধ্যে একটু-একটু ডাকতে লেগেছে। একটা ফটিংপাখি শিস দিতে দিতে মাঠের ওপারে চলে গেল। ছাতারেগুলো কিচমিচ ঝুপ-ঝুপ করে কাঁঠালগাছের তলায় নেমে পড়ল। আলো নিবিয়ে সুজাতা আর পুন্নাকে নিয়ে সোয়াস্তি নদীর ধারে এসে দাঁড়াল। তখন দূরের গাছপালা একটু-একটু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে; নদীর পারে দাঁড়িয়ে সুজাতা দেখছেন—বটগাছের নিচে যিনি বসে রয়েছেন—তাঁর গেরুয়া কাপড়ের আভা বনের মাথায় আধখানা আকাশ আলো করে দিয়েছে সকালের রঙে। সুজাতা, পুন্না মনের মতো করে পুজো দিয়ে সিদ্ধার্থের আশীর্বাদ নিয়ে চলে গেছে। সোয়াস্তি তাঁকে কিছু দিতে পারেনি; তাই সে সারাদিন নদীর ধারে একলা বসে অনেক যত্নে কুশিঘাসের একটি আসন বুনে নদীর জলে সেখানি ঠাণ্ডা করে সিদ্ধার্থকে দেবার জন্য এসেছে। সিদ্ধার্থ তখনো বটতলাতে আসেননি। সোয়াস্তি কুশাসনখানি বেদীর উপরে বিছিয়ে দিয়ে মনে-মনে সিদ্ধার্থকে প্রণাম করে নদীপারে চলে গেল।

তখন সন্ধ্যা হয়-হয়; সিদ্ধার্থ অঞ্জনায় স্নান করে সোয়াস্তির দেওয়া কুশাসনে এসে বসলেন। জলে-ধোয়া কুশঘাসের মিষ্টি গন্ধে তাঁর মন যেন আজ আরাম পেয়েছে। পূর্ণিমার আলোয় পৃথিবীর শেষ-পর্যন্ত আজ যেন

তিনি দেখতে পাচ্ছেন—স্পষ্ট, পরিষ্কার।

পাথরের বেদীতে কুশাসনে বসে সিদ্ধার্থ আজ প্রতিজ্ঞা করলেন, এ শরীর থাক আর যাক, দুঃখের শেষ দেখবই-দেখব—সিদ্ধ না হয়ে, বুদ্ধ না হয়ে এ আসন ছেড়ে উঠছি না। বজ্রাসনে অটল হয়ে সিদ্ধার্থ আজ যখন ধ্যানে বসে বললেন—

‘ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে।’



তখন 'মার'—যার ভয়ে সংসার কম্পমান, যে লোককে কুবুদ্ধি দেয়, কুকথা বলায়, কুকর্ম করায়—সেই 'মার'-এর সিংহাসন টলমল করে উঠল। রাগে মুখ অন্ধকার করে 'মার' আজ নিজে আসছে মার-মার শব্দে বুদ্ধের দিকে।

চারিদিকে আজ 'মার'-এর দলবল জেগে উঠেছে! তারা ছুটে আসছে, যত পাপ, যত দুঃখ, যত কালি, যত কলঙ্ক, যত জ্বালা-যন্ত্রণা, মলা আর ধূলা—জল-স্থল-আকাশের দিকে-বিদিকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে। পূর্ণিমার আলোর উপরে কালোর পর্দা টেনে দিয়েছে—'মার'! সেই কালোর ভিতর থেকে পূর্ণিমার চাঁদ চেয়ে রয়েছে—যেন একটা লাল চোখ! তা থেকে ঝরে পড়ছে পৃথিবীর উপর আলোর বদলে রক্ত-বৃষ্টি! সেই রক্তের ছিটে লেগে তারাগুলো নিবে-নিবে যাচ্ছে।

আকাশকে এক-হাতে মুঠিয়ে ধরে, পাতালকে এক পায়ে চেপে রেখে, 'মার' আজ নিজমূর্তিতে সিদ্ধার্থের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার গায়ে উড়ছে রাঙা চাদর—যেন মানুষের রক্তে ছোপানো! তার কোমরে ঝুলছে বিদ্যুতের তরোয়াল, মাথার মুকুটে দুলছে 'মার'-এর প্রকাণ্ড একটা রক্তমণির দুল, তার কানে দুলছে মোহন কুণ্ডল, তার বুকের উপর জ্বলছে অনল-মালা—আগুনের সুতোয় গাঁথা।

বুক ফুলিয়ে 'মার' সিদ্ধার্থকে বলছে—"বৃথাই তোমার বুদ্ধ হতে তপস্যা! উত্তিষ্ঠ—ওঠো! কামেশ্বরোহস্মি—আমি 'মার'। ত্রিভুবনে আমাকে জয় করে এমন কেউ নেই! উত্তিষ্ঠ উত্তিষ্ঠ মহ্যবিষয়স্থং বচং কুরুষ্ব—ওঠো চলে যাও, আমাকে জয় করতে চেষ্টা কর না। আমার আজ্ঞাবাহী হয়ে থাক, ইন্দ্রের ঐশ্বর্য তোমায় দিচ্ছি, পৃথিবীর রাজা হয়ে সুখভোগ কর; তপস্যায় শরীর ক্ষয় করে কি লাভ? আমাকে জয় করে বুদ্ধ হওয়া কারো সাধ্যে নেই।"



সিদ্ধার্থ 'মার'-কে বললেন—"হে 'মার'! আমি জন্ম-জন্ম ধরে বুদ্ধ হতে চেষ্টা করছি—তপস্যা করছি, এবার বুদ্ধ হব তবে এ আসন ছেড়ে উঠব, এ শরীর থাক বা যাক এই প্রতিজ্ঞা—

'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং

ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে।'

তিনবার 'মার' বললে—"উত্তিষ্ঠ, চলে যাও, তপস্যা রাখ!" তিনবারই সিদ্ধার্থ বললেন, "না! না! না! নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে।"

রাগে দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করে বিকট হুঙ্কার দিয়ে তখন আকাশ ধরে টান দিলে 'মার'! তার নখের আঁচড়ে অমন যে চাঁদ-তারায় সাজানো নীল আকাশ সেও ছিঁড়ে পড়ল শত টুকরো হয়ে একখানি নীলাম্বরী শাড়ির মতো। মাথার উপরে আর চাঁদ নেই, তারা নেই; রয়েছে কেবল মহাশূন্য, মহা অন্ধকার! মুখ মেলে কে যেন পৃথিবীকে গিলতে আসছে। বোধ হয় তার কালো জিভ বেয়ে পৃথিবীর উপর পড়ছে জমাট রক্তের মতো কালো নাল! 'মার' সেই অন্ধকার মুখটার দিকে ফিরে দেখেছে কি আর বিদ্যুতের মতো দু'পাটি শাদা দাঁত শূন্যে ঝিলিক দিয়ে কড়মড় করে উঠেছে; আর হুঙ্কার দিয়ে বেরিয়ে এসেছে সেই সর্বগ্রাসী মুখের ভিতর থেকে 'মার'-এর দল; চন্দ্র সূর্য ঘুরছে তাদের হাতে দুটো যেন আগুনের চরকা! দশদিক অন্ধকার করে ঘুরতে ঘুরতে আসছে—'মার'-এর দল ঘূর্ণি বাতাসে ভর দিয়ে, পৃথিবী জুড়ে ধূলার ধ্বজা উড়িয়ে! তারা শূন্য থেকে ধূমকেতুগুলোকে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে ফেলছে আগুনের ঝাঁটার মতো। পৃথিবী থেকে গাছগুলোকে উপড়ে, পাহাড়গুলোকে মুচড়ে নিয়ে বন্-বন্ শব্দে ঘুরিয়ে ফেলছে তারা চারিদিক থেকে অনবরত শিলাবৃষ্টির মতো; লক্ষ-লক্ষ ক্ষ্যাপা ঘোড়া যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে 'মার'-সৈন্য বুদ্ধদেবের চারিদিকে! তাদের খুর থেকে বিদ্যুৎ ঠিকরে পড়ছে, তাদের মুখ থেকে রক্তের জ্বলন্ত ফেনা আঁজলা-আঁজলা ছড়িয়ে পড়ছে—সেই বোধিবটের চারিদিকে, সেই পাথরের বেদীর আশেপাশে। উরাইল-বনের প্রত্যেক গাছটি পাতাটি ফুলটি এমন কি ঘাসগুলিও আজ জ্বলে উঠেছে; জ্বলন্ত রক্তে অঞ্জনার জল ঘুরে ঘুরে চলেছে আগুন মাখা। বিদ্যুতের শিখায় তলোয়ার শানিয়ে মশাল জ্বালিয়ে, দলের পর দল যত রক্তবীজ, তারা অন্ধকার থেকে বেরিয়ে ঝাঁকে-ঝাঁকে উড়ে পড়ছে আজ বুদ্ধদেবের উপরে। তাদের আগুন-নিশ্বাসে আকাশ গলে যাচ্ছে, বাতাস জ্বলে যাচ্ছে, পৃথিবী দেখা যাচ্ছে যেন একখানা জ্বলন্ত কয়লা, ঘূর্ণিবাতাসে ঘুরে-ঘুরে চলেছে আগুনের ফুলকি ছড়াতে-ছড়াতে; তার মাঝে জ্বলন্ত একটা তালগাছ ঘুরিয়ে 'মার' ডাকছে—'হান! হান!'

পায়ের নখে রসাতল চিরে জেগে উঠেছে মহামারী। আজ 'মার'-এর ডাকে রসাতলের কাজল অন্ধকার কাঁথার মতো সর্বাঙ্গে উড়িয়ে নিয়ে আর্তনাদ করে ছুটে আসছে—সে 'মারী'। তার ধুলোমাখা কটা চুল বাতাসে উড়ছে—আকাশ জোড়া ধূমকেতুর মতো! দিকে-দিকে শোকের কান্না উঠেছে, ত্রিভুবন থর-থর কাঁপছে! মহামারীর গায়ের বাতাস যেদিকে লাগল সেদিকে পাহাড় চূর্ণ হয়ে গেল, পাথর ধুলো হয়ে গেল, বন-উপবন জ্বলে গেল, নদী-সমুদ্র শুকিয়ে উঠল। আর কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না! সব মরুভূমি হয়ে গেছে, সব শুয়ে পড়েছে, নুয়ে পড়েছে, জ্বলে গেছে, পুড়ে গেছে, ধুলো হয়ে ছাই হয়ে উড়ে গেছে! জগৎ জুড়ে উঠেছে 'মারী'র আর্তনাদ, 'মার'-এর সিংহনাদ, আর শ্মশানের মাংস-পোড়া বিকট গন্ধ।

তখন রাত এক প্রহর। 'মার'-এর দল, 'মারী'-র দল উল্কামুখী শিয়ালের মতো, রক্ত-আঁখি বাদুড়ের মতো মুখ থেকে আগুনের হলকা ছড়িয়ে চারিদিকে হাহা হুহু করে ডেকে বেড়াচ্ছে, কেঁদে বেড়াচ্ছে! আকাশ ঘুরছে মাথার

উপর, পৃথিবী ঘুরছে পায়ের তলায় ঘর্ঘর শব্দে—যেন দুখানা প্রকাণ্ড জাঁতার পাথর বুদ্ধদেবকে পিষে ফেলতে চেষ্টা করছে! 'মার' দু'হাতে দুটো বিদ্যুতের মশাল নিয়ে বুদ্ধদেবকে ডেকে বলছে—'পালাও, পালাও, এখনো বলছি তপস্যা রাখ!' বুদ্ধদেব 'মার'-এর দিকে চেয়েও দেখছেন না, তার কথায় কর্ণপাতও করছেন না। 'মার'-এর মেয়ে 'কামনা', তার ছোট দুইবোন 'ছলা-কলা' কে নিয়ে বুদ্ধদেবের যোগভঙ্গ করতে বত চেষ্টা করছে—কখনো গৌতমী মায়ের রূপ ধরে, কখনো যশোধরার মতো হয়ে বুদ্ধদেবের কাছে হাত-জোড় করে কেঁদে-কেঁদে লুটিয়ে পড়ে! তাঁর মন গলাবার, ধ্যান ভাঙাবার চেষ্টায় কখনো তারা স্বর্গের বিদ্যাধরী সেজে গান গায়, নাচে, কিন্তু কিছুতেই বুদ্ধদেবকে ভোলাতে আর পারে না। বজ্রাসনে আজ তিনি অটল হয়ে বসেছেন, তাঁর ধ্যান ভাঙে কার সাধ্য! যে'মার'-এর তেজে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল কম্পমান, যার পায়ের তলায় ইন্দ্র-চন্দ্র-বায়ু-বরুণ, জল-স্থল-আকাশ—সেই 'মার'-এর দর্পচূর্ণ হয়ে গেল আজ বুদ্ধের শক্তিতে! 'মার' আজ বুদ্ধের একগাছি মাথার চুলও কাঁপাতে পারলে না, সেই অক্ষয়বটের একটি পাতা, সেই পাথরের বেদীর একটি কোণও খসাতে পারলে না! বুদ্ধের আগে মার' একদণ্ডও কি দাঁড়াতে পারে। বুদ্ধের দিকে ফিরে দেখবারও আর তার সাহস নেই। দুই হাতের মশাল নিবিয়ে রণে ভঙ্গ দিয়ে 'মার' আস্তে-আস্তে পালিয়ে গেছে—নরকের নীচে, ঘোর অন্ধকারে, চারিদিক কালো করে দিয়ে। বুদ্ধদেব সেই কাজল অন্ধকারের মাঝে নির্ভয়ে একা বসে রয়েছেন, ধ্যান ধরে পহরের পর পহর। রাত শেষ হয়ে আসছে। কিন্তু 'মার'-এর ভয়ে তখনো পৃথিবী এক-একবার কেঁপে উঠছে—চাঁদও উঠতে পারছে না, সকালও আসতে পারছে না। সেই সময় ধ্যান ভেঙে 'মার'কে জয় করে সংসার থেকে ভয় ঘুচিয়ে বুদ্ধ দাঁড়ালেন। তিনি আজ সিদ্ধ হয়েছেন, বুদ্ধ হয়েছেন, দুঃখের শেষ পেয়েছেন। ডান হাতে তিনি পৃথিবীকে অভয় দিচ্ছেন, বাঁ-হাতে তিনি আকাশের দেবতাদের আশ্বাস দিচ্ছেন। তাঁর সোনার অঙ্গ ঘিরে সাতরঙের আলো। সেই আলোতে জগৎ-সংসার আনন্দে জয়-জয় দিয়ে জেগে উঠেছে, নতুন প্রাণ পেয়ে, নতুন সাজে সেজে। বুদ্ধের পায়ের তলায় গড়িয়ে চলেছে নৈরঞ্জন নদীটি একূলে ওকূলে শান্তিজল ছিটিয়ে।

যেখানে কাশী, সেখানে গঙ্গা একখানি ধারাল খাঁড়ার মতো বেঁকে চলেছেন। আর ঋষিপত্তনের নিচেই বরুণা নদীর পাড় পাহাড়ের মতো শক্ত। তার গায়ে বড়-বড় সব গুহা-গর্তে যত জটাধারী বক-বেড়ালি-ব্রহ্মচারী ধুনি জ্বালিয়ে ছাইভস্ম মেখে বসে রয়েছে। পাড়ের উপরেই সারনাথের মন্দির। মন্দিরের পরই গাছে-গাছে-ছায়া-করা তপোবন। সেইখানে সত্যি যাঁরা ঋষি তপস্বী তাঁরা রয়েছেন। হরিণ তাঁদের দেখে ভয় খায় না, পাখি তাঁদের দেখে উড়ে পালায় না। তাঁরা কাউকে কষ্ট দেন না। কারু ঘুম ভাঙবার আগেই তাঁরা একটিবার বন থেকে বেরিয়ে নদীতে স্নান করে যান; দিনরাতের মধ্যে তপোবন ছেড়ে তাঁরা আর বার হন না। দেবলঋষি নালককে নিয়ে এই তপোবনের একটি বটগাছের তলায় আজ ক'মাস ধরে রয়েছেন।

তখন আষাঢ় মাস। বেলা শেষ হয়েও যেন হয় না—রোদ পড়েও যেন পড়তে চায় না। সারনাথের মন্দিরে সন্ধ্যার শাঁখ ঘন্টা বাজছে, কিন্তু তখনো আষাঢ়ন্ত বেলার সোনার রোদ গাছের মাথায় চিকচিক করছে, হরিণগুলি তখনো আস্তে-আস্তে চরে বেড়াচ্ছে, ছোট-ছোট সবুজ পাখিগুলি এখনো যেখানটিতে একটুখানি রোদ সেইখানটিতে কিচমিচ করে খেলে বেড়াচ্ছে। একলাটি বসে নালক বর্ষাকালের ভরা নদীর দিকে চুপ করে চেয়ে রয়েছে। একটা শাদা বক তার চোখের সামনে দিয়ে কেবলি নদীর এপার-ওপার আনাগোনা করছে—সে যেন ঠিক করতে পারছে না কোন পারে বাসা বাঁধবে।

বর্ষাকালের একটানা নদী আজ সারাদিন ধরে নালকের মানটিকে টানছে—সেই বর্ধনের বনের ধারে, তাদের সেই গাঁয়ের দিকে। সেই তেঁতুলগাছের ছায়া-করা মাটির ঘরে তার মায়ের কাছে নালকের মন একবার ছুটে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে। মন তার যেতে চাচ্ছে মায়ের কাছে, কিন্তু ঋষিকে একলা রেখে আবার যেতেও মন সরছে না। সে ওই বকটার মতো কেবলি যাচ্ছে আর আসছে, আসছে আর যাচ্ছে! দেবলঋষি নালককে ছুটি দিয়েছেন তার মায়ের কাছে যেতে। এদিকে আবার ঋষির মুখে নালক শুনেছে বুদ্ধদেব আসছেন এই ঋষিপত্তনের দিকে। আজ সে কত-বছর নালক ঘর ছেড়ে এসেছে; মাকে সে কতদিন দেখেনি! অথচ বুদ্ধদেবকে দেখবার সাধটুকু সে ছাড়তে পারছে না। সে একলাটি নদীর ধারে বসে ভাবছে—যায় কি না-যায়। সকাল থেকে একটির পর একটি কত নৌকো কত লোককে যার যার দেশে নামিয়ে দিতে-দিতে চলে গেল। কত মাঝি নালককে ‘যাবে গো!’ বলে ডেকে গেল। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আর একখানি মাত্র ছোট নৌকো নালকের দিকে পাল তুলে আসছে—অনেকদূর থেকে। তার আলোটি দেখা যাচ্ছে—নদীর জলে একটি ছোট পিদিম ঝিক-ঝিক করে ভেসে চলেছে। এইখানি চলে গেলে এদিকে আর নৌকো আসবে না। নালক মনে-মনে দেবঋষিকে প্রণাম করে বলছে—‘ঠাকুর, যেন বুদ্ধদেবের দর্শন পাই।’



দেখতে-দেখতে নৌকো এসে তপোবনের ঘাটে লাগল। সেই ছোট নৌকোয় নালক তার মাকে দেখতে দেশের দিকে চলে গেল। আজ কত বছর সে তার মাকে দেখেনি। ঠিক সেই সময় বরুণার খেয়াঘাট পার হয়ে বুদ্ধদেব সারনাথের তপোবনে এসে নামলেন। আর একটি দিন যদি নালক সেখানে থেকে যেত!

কত দেশবিদেশ ঘুরে, কত নদীর চরে খালের ধারে নিত্য সন্ধ্যাবেলায় ভিড়তে-ভিড়তে নালকদের নৌকোখানি চলেছে—যে গাঁয়ের যে লোক তাকে সেই গাঁয়ে রেখে। পুরোনো যাত্রী যেমন নিজের গাঁয়ে নেমে যাচ্ছে অমনি তার জায়গায় ঘাট থেকে নুতন যাত্রী এসে নৌকোয় উঠছে। এমনি করে নালকদের নৌকো কখনো চলেছে সকালের বাতাসে পাল তুলে দিয়ে তীরের মতো জল কেটে, কখনো বা চলেছে রাতের অন্ধকারের ভিতর দিয়ে কালো জলে পিদিমের একটি আলোর দাগ টেনে—এমন আস্তে যে মনেই হয় না যাচ্ছি। দিনে-দিনে বর্ষাকালে নদী জলে ভরে উঠছে। আগে কেবল নদীর উঁচু পাড়ই দেখা যাচ্ছিল, এখন উপরের খেতগুলো, তার ওধারে গাঁয়ের গাছগুলো ঘরগুলো, এমন কি অনেক দূরের মন্দিরটি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। জল উঁচু হয়ে উঠে বালির চরগুলো সব ডুবিয়ে দিয়েছে।

নৌকো যখন নালককে দেশের ঘাটে নামিয়ে দিয়েছে তখন ভরা শ্রাবণ মাস; ঝুপ-ঝুপ বৃষ্টি পড়ছে, নদীর ধারে-ধারে বাঁশঝাড়ের গোড়া পর্যন্ত জল উঠেছে। থৈ-থৈ করছে জল! খালবিল খানা-খন্দ ভরে গেছে, ঘাটের ধাপ সব ডুবে গেছে—স্রোতের জলে বর্ষাকালের নূতন জলে। নালক ঘাটে দাঁড়িয়ে দেখছে কতদূর থেকে কার হাতের একটি ফুল ভাসতে-ভাসতে এসে ঘাটের এক কোণে লেগেছে; নদীর ঢেউ সেটিকে একবার ডাঙার দিকে, একবার জলের দিকে ফেলে দিচ্ছে আর টেনে নিচ্ছে। নালক জল থেকে ফুলটিকে তুলে নিয়ে, মনে-মনে বুদ্ধদেবকে পুজো করে মাঝ-নদীতে আবার ভাসিয়ে দিলে। তারপর আস্তে-আস্তে সেই ঘরের দিকে চলে গেল—বৃষ্টির জলে ভিজতে-ভিজতে। এই ফুলটির মতো নালক—সে মনে পড়ে না কতদিন আগে—ঋষির সঙ্গে-সঙ্গে ঘর ছেড়ে, মাকে ফেলে সংসারের বাইরে ভেসে গিয়েছিল। আজ এতকাল পরে সে আবার ওই ফুলটির মতোই ভাসতে-ভাসতে তার দেশের ঘাটে, মায়ের কোলের কাছে ফিরে এসে আটকা পড়ল। আবার সেদিন কবে আসবে, যেদিন বুদ্ধদেব এই দেশে এসে ঘাটের ধারে আটকা-পড়া ফুলটির মতো তাকে তুলে নিয়ে আনন্দের মাঝ-গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে যাবেন।

নালক তাদের ঘরখানি দেখতে পাচ্ছে, আর দেখতে পাচ্ছে ঘরের দাওয়ায় তার মা বসে রয়েছেন, আর উঠোনের মাঝে একটি ভিখারী দাঁড়িয়ে গাইছে—

‘এরে ভিখারী সাজায়ে তুমি কি রঙ্গ করিলে!’

নালক • অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ই-বুকটি সমাপ্ত হল ॥